পঞ্চনদের তীরে

(উপন্যাস)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সমবায় পাব্‌লিশার্স কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান : বুক ফোরাম : ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

দেশভক্ত প্রবীণ সাহিত্য-সেবক

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

অন্যান্য প্রকাশাবলী

মুখপাত

প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত বীর ও সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের পরিষ্কার ধারণা নেই। ভারতব্যাপী দেশাত্মবোধের এই নব-জাগরণের যুগেও দেশীয় বিদ্যামন্দিরের পাঠ্য ইতিহাসে এখনকার ছেলে-মেয়েদের এ-সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা দেখা যায় না। আমাদের সত্যিকার জাতীয় জীবনের এই অসাড়তা লক্ষ্য করলে হতাশ হ'তে হয়।

"পঞ্চনদের তীরে" উপন্যাস বটে, কিন্তু এর আখ্যানবস্তু কোথাও ঐতিহাসিক ভিত্তি ছেড়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে নি। যে-সময়ের কথা আমি বলতে বসেছি, সে-সময়কার ঐতিহাসিক সূত্র এখনো নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, সেই কারণে স্থলবিশেষে উপন্যাসের মর্যাদা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার জন্যে কিছু-কিছু কল্পনার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সে-কল্পনাও কোথাও ঐতিহাসিক সত্যকে বাধা দেয় নি।

ধরুন, শশীগুপ্তের কথা। ঐ দেশদ্রোহীর শেষ-জীবন অতীতের অন্ধকারের মধ্যে চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়ে গেছে, ইতিহাসও তার সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু তার একটা পরিণাম না দেখালে উপন্যাস হয় অসম্পূর্ণ। অতএব ওখানে কল্পনা ব্যবহার করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই এবং গোঁড়া ঐতিহাসিকরাও সে-জন্যে আপত্তি প্রকাশ করবেন ব'লে মনে হয় না। তারপর ধরুন, সুবন্ধু প্রভৃতি সম্পর্কীয় ঘটনাবলী। প্রাচীন ইতিহাসকে ভালো ক'রে গল্পের ভিতর দিয়ে দেখাবার জন্যেই ওদের অবতারণা করা হয়েছে। সুবন্ধু প্রভৃতি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বটে, কিন্তু সেকালকার ভারতে ওদের মতন লোকের ভিতরেও যে অতুলনীয় বীরত্ব ও স্বদেশভক্তির অভাব ছিল না, Massaga নামক স্থানে আলেকজান্ডারের দ্বারা সাত-হাজার

ভারতীয় ভৃতক-সৈন্যের (mercenaries) হত্যাকাণ্ডেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা প্রত্যেকে সপরিবারে প্রাণ দিলে, তবু বিদেশী শত্রুর অধীনে চাকরী স্বীকার করলে না! অতএব কাল্পনিক হ'লেও সুবন্ধু প্রভৃতিকে আমরা ঐতিহাসিক ভারতীয় চরিত্র ব'লে গ্রহণ করতে পারি অনায়াসেই।

পঞ্চনদের তীরে স্বাধীন ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখানোই হচ্ছে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই কারণে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী জীবন দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি নি, প্রসঙ্গক্রমে সর্বশেষে দু-চারটি ইঙ্গিত দিয়েছি মাত্র।

এই বইখানি কেবল যারা বয়সে বালক তাদের জন্যেই লেখা হ'ল না। পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে এদেশের বয়স্ক পাঠকরাও বালকদের চেয়ে কম অজ্ঞ নন। বইখানি লেখবার সময়ে তাঁদের কথাও বার বার মনে হয়েছে। ইতি—

২৩০।১, অপার চিৎপুর রোড,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়ার কথা

"পঞ্চনদের তীরে,
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ—
নির্মম, নির্ভীক।"

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব গাথার কথা তোমরা সকলে নিশ্চয়ই জানো।

কিন্তু পঞ্চনদের তীরে শিখরাই কেবল জেগে ওঠেনি, এখানেই সর্বপ্রথমে জাগ্রত হয়েছিল আর্য ভারতবর্ষের বিরাট আত্মা।

পঞ্চনদের তীরেই হয়েছে বারে বারে ভারতবর্ষের উত্থান এবং পতন। কত—কত বার ভারত উঠেছে পড়বার জন্যে এবং পড়েছে ওঠবার জন্যে। আহত হয়েছে, নিহত হয়নি।

এই পঞ্চনদের তীরে কোন্ স্মরণাতীত কালে অনার্য জনপদের উপরে বন্যাপ্রবাহের মতো ভেঙে পড়েছিল আর্য অভিযানের পর অভিযান! এবং তারপর এই পঞ্চনদের তীরেই দেখা গেল যুগে যুগে কত জাতির পর জাতির মিছিল—পার্সী, গ্রীক, শক, হুন, তাতার মোগল ও পাঠান! যে পথে তারা মহাভারতকে সম্ভাষণ করতে বেরিয়েছিল, সেই চিরবিখ্যাত খাইবার গিরিসঙ্কট আজও

অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি উদ্ধত ভ্রূকুটিভঙ্গে! কত মহাকাব্য আবৃত্তি করতে পারে ওখানকার প্রতি ধূলিকণা!

কেবল ব্রিটিশ-সিংহের গর্জন ভেসে এসেছে ভারত-সাগরের ওপার হ'তে। কিন্তু মহাসাগরকে সেকালের ভারতবর্ষ এক হিসাবে কখনো খুব বড় ক'রে দেখেনি—কারণ সমুদ্র-পথ ছিল তারই নিজস্ব দিগ্বিজয়ের পথ। ওপথে বেরিয়েছে সে নিজে দেশে দেশে বাণিজ্য করতে, ধর্মপ্রচার করতে, রাজ্যজয় করতে, উপনিবেশ স্থাপন করতে—কাম্বোডিয়ায়, জাভায় এবং মিশরে! এবং মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া থেকে গ্রীসে ও রোমে! ও-পথে তাকে জয় করবার জন্যে আর কেউ যে আসতে পারে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বপ্নে এ কাহিনী ছিল না।

তোমরা কি ভাবছো? আমি গল্প বলছি, না ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করছি? কিন্তু একটু ধৈর্য ধরো। তোমরা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র কথা শুনতে ভালোবাসো। এবারে যে বিচিত্র 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র কথা বলবো, তা হচ্ছে মহা ভারতের ও মহা গ্রীসের মহা অ্যাড্‌ভেঞ্চার!

মধ্য-এসিয়া থেকে দক্ষিণ দিকে যখন আর্য অভিযান সুরু হয়, তখন তাদের একদল আসে ভারতবর্ষে, আর একদল যায় পারস্যে। অর্থাৎ ভারতবাসী আর্য আর পারস্যবাসী আর্যরা ছিলেন মূলত একই জাতি। প্রাচীন ভারতের ও প্রাচীন পারস্যের ধর্মের মধ্যেও এই একত্বের যথেষ্ট প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু বহু শতাব্দী বিভিন্ন দেশে বাস ক'রে ভারতবাসীরা ও পারসীরা নিজেদের এক-জাতীয়তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেল।

আর্য হিন্দুরা বাস করতেন উত্তর-ভারতে। এবং ভারতের দক্ষিণ প্রদেশকে তাঁরা অনার্য-ভূমি ব'লে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এমন-কি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গকেও তাঁরা আমোলে আনতেন না, কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-অঞ্চলে এলে তাঁকে পতিত ব'লে মনে করা হ'ত।

সেই পুরাণো মনোভাব আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি। আজও উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণরা বাঙালী ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না।

কিন্তু এই ঘৃণিত অনার্য-ভূমি বা পূর্ব-ভারতের বর্ণশঙ্কর ক্ষত্রিয়রাই পরে ধর্মে আর বীরত্বে সারা ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন—অদৃষ্টের এমনি পরিহাস! বাঙলাদেশের আশেপাশেই মাথা তুলে দাঁড়াল শিশুনাগ-বংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ (যে-বংশে জন্মান চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক), ও গুপ্ত-বংশ প্রভৃতি, খাঁটি আর্য না হয়েও এই-সব বংশের বীরবৃন্দ ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে ফেললেন।

ধর্মেও দেখি এই অঞ্চলে খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধমতের আবির্ভাব এবং বুদ্ধদেবও সৎ-ক্ষত্রিয় ছিলেন না।

এই সময়েই ভারতীয় হিন্দুদের করতলগত পঞ্চনদের তীরে প্রথম বিদেশী শত্রু—অর্থাৎ পারস্যের রাজা প্রথম দরায়ুস মুক্ত তরবারি হাতে ক'রে দেখা দেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ছিল না। সুতরাং আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানা যায় না। কিন্তু পারসীরা বলে, তারা ভারতবর্ষ জয় করেছিল। তবে ঐতিহাসিকদের মত হচ্ছে, পারসীরা সিন্ধুনদের তীরবর্তী দেশগুলি ছাড়িয়ে বেশীদূর এগুতে পারেনি! তার বাইরে গোটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে তখন যে-সব পরাক্রান্ত রাজা-রাজড়া বাস করতেন, তাঁদের স্বাধীনতা ও শক্তি ছিল অক্ষুণ্ণ।

পারসীদের অধীনে যে জনকয়েক করদ ভারতীয় রাজা ছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গ্রীসের সঙ্গে যখন পারস্যের শক্তি-পরীক্ষা হয় বারংবার, তখন পরবর্তী যুগেও সিন্ধুতটবাসী কয়েকজন ভারতীয় রাজা পারসীদের সাহায্য করবার জন্যে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন।......

পট-পরিবর্তন করলেই দেখি, এর পরের দৃশ্য হচ্ছে একেবারে খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। ভারতবর্ষে তখন বৈদিক হিন্দুধর্মের

বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে বৌদ্ধধর্ম। পাঞ্জাবে তখন বীর ও সৎক্ষত্রিয় ব'লে মহারাজা পুরুর বিশেষ খ্যাতি। পূর্ব-ভারতে অধ-আর্য নন্দবংশ রাজত্ব করছে। চন্দ্রগুপ্ত তখন যুবক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুদ্ধবিদ্যা শিখে তিনি শক্তি সঞ্চয় করছেন—ভারতবর্ষের সিংহাসনের দিকে তাঁর লোলুপ দৃষ্টি।

প্রতীচ্যের প্রধান নাট্যশালা তখন গ্রীসে। এই গ্রীকরাও ছিলেন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু ও পারসীদের মতোন আর্য, তাঁদেরও পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন স্মরণাতীত কাল পূর্বে মধ্য-এসিয়ার আদি আর্যস্থান থেকে। অধিকাংশ য়ুরোপে তখন অসভ্য বর্বরদের বাস এবং রোম হচ্ছে শিশু,—মহা গ্রীসের শৌর্য-বীর্য ও সভ্যতার যবনিকা সরিয়ে তার দৃষ্টি ভবিষ্যতের বিরাট অপূর্বতা তখনও দেখতে পায়নি।

গ্রীসে তখন নূতন নাটক রচনার চেষ্টা করছে মাসিডনিয়া—আর্যাবর্তে অর্ধ-আর্য পূর্ব-ভারতের চন্দ্রগুপ্তের মতো। এবং মাসিডনিয়ার বাসিন্দাদেরও কুলীন গ্রীকরা মনে করতেন অধ-গ্রীক ও অর্ধ-বর্বরের মতো।

মাসিডনিয়ার অধিপতি ফিলিপ নিজের বাহুবলে গ্রীকজগতে কৌলীন্য অর্জন করেছিলেন। অকালে শত্রু-কবলে ফিলিপ যখন অপঘাতে মারা পড়লেন, তখন তাঁর পুত্র আলেকজাণ্ডার পেলেন সিংহাসনের সঙ্গে পিতার স্বহস্তে শিক্ষিত দুর্ধর্ষ, বিপুল সৈন্যবাহিনী। তাঁর বয়স তখন বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই তিনি লাভ করেছিলেন পিতার রাজনৈতিক বুদ্ধি ও যুদ্ধ প্রতিভা এবং মাতা ওলিম্পিয়াসের ধর্মোন্মাদ, আবেগ-বিহ্বলতা ও কল্পনা-শক্তি।

কৌলীন্য-গর্বিত গ্রীকরা অর্ধ-সভ্য বালক-রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করলে। কিন্তু আলেকজাণ্ডার তখনি খাপ থেকে তরবারি খুলে সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মূর্তিমান ঝড়ের মতো এবং অত্যন্ত অনায়াসে সমস্ত বিদ্রোহ দমন ক'রে দেখিয়ে

দিলেন, তিনি বালক বটে, কিন্তু দুর্বলও নন, নির্বোধও নন! যার বাহুবল ও বীরত্ব আছে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় ক্ষত্রিয় আর কেউ নেই।

খাঁটি হিন্দু সংস্কৃতি আর সভ্যতার অধঃপতনের সময়েই ভারতবর্ষে অর্ধ-আর্য চন্দ্রগুপ্ত ও সম্রাট অশোক প্রভৃতির আবির্ভাব। তাঁদের প্রতিভা ভারতীয় সংস্কৃতি আর সভ্যতাকে আজও ক'রে রেখেছে বিশ্বের বিস্ময়।

এবং আদিম গ্রীক ও সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধঃপতনের যুগেই অর্ধ-গ্রীকরূপে গণ্য আলেকজাণ্ডার আত্মপ্রকাশ করেন। গ্রীক সভ্যতার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করবার ভার নিলেন তিনিই। কুলীন গ্রীকরা তাঁকে ঘৃণা করতেন বটে, কিন্তু তিনি না থাকলে গ্রীকসভ্যতার মহিমা আজ এমন অতুলনীয় হ'তে পারত না। তাঁর প্রতিভায় গ্রীক সংস্কৃতির খ্যাতি প্রতীচ্যের সীমা পেরিয়ে ভারতের পঞ্চনদের তীরে ও মধ্য-এসিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

গ্রীসের প্রতিবেশী ছিল তখন প্রাচ্যের সব-চেয়ে পরাক্রান্ত রাজ্য পারস্য। পারসীরা একাধিকবার গ্রীকদের আক্রমণ করেছিল। গ্রীকরা কোনো রকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তাদের দুর্দশা হয়েছিল যৎপরোনাস্তি। নিজেকে সমগ্র গ্রীসের দলপতিরূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তরুণ বীর আলেকজাণ্ডার বললেন, "গ্রীস আমার স্বদেশ। প্রাচ্যের পারসীরা আমার স্বদেশের উপর যখন অত্যাচার করেছে, আমিও পারস্য-সাম্রাজ্য অধিকার ক'রে প্রতিশোধ নেবো।"

পারস্য-সাম্রাজ্য তখন পারস্যেরও বাইরে এসিয়া-মাইনরে, মিশরে, বাবিলনে ও ভারতে সিন্ধুনদের তট পর্যন্ত বিস্তৃত। পারস্যের সিংহাসনে বসেছেন তখন তৃতীয় দরায়ুস কোডোমেন্নাস। তিনি মহা-সম্রাটরূপে পরিচিত বটে, কিন্তু তাঁর যুদ্ধপ্রতিভা ছিল না।

ইস্‌সাস্‌ রণক্ষেত্রে প্রথমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শক্তি পরীক্ষা হয় (খৃঃ পূঃ ৩৩২)। ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে দরায়ুস আক্রমণ করলেন আলেকজাণ্ডারকে। সংখ্যায় গ্রীকরা যথেষ্ট দুর্বল ছিল এবং দরায়ুসের যুদ্ধপ্রতিভা থাকলে সেইদিনই মিলিয়ে যেত আলেক-জাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন। কিন্তু অতিশয় নির্বোধের মতো দরায়ুস একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে নিজের বিপুল বাহিনী চালনা করলেন। ফলে সংখ্যায় ঢের বেশী হয়েও পারসীরা কিছুই করতে পারলে না। তারা পঙ্গপালের মতো দলে দলে মারা পড়ল, বাদবাকী ইউফ্রেটেস্‌ নদী পেরিয়ে পালিয়ে গেল।

পরে-পরে আরো অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আলেকজাণ্ডার পারস্য-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ দখল করলেন। পারস্যের রাজধানী বিখ্যাত নগর পার্সিপোলিস্‌কে অগ্নিশিখায় আহুতি দেওয়া হ'ল এবং এক স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকের হস্তে দরায়ুসও মারা পড়লেন।

বিজয়ী আলেকজাণ্ডার তখন সগর্বে পৃথিবীর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। কিন্তু য়ুরোপে ও আফ্রিকায় তখনকার সভ্য-জগতে নিজের কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পেলেন না। রোমের জন্ম হয়েছে, কিন্তু আগেই বলেছি, সে তখন শিশু।

হঠাৎ আলেকজাণ্ডারের মনে পড়ল ভারতবর্ষের কথা। ভারতীয় সভ্যতার খ্যাতি তখন দেশ-দেশান্তর অতিক্রম ক'রে গ্রীসেও গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাণিজ্য-পথেও ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের আদর কম নয়। ভারতে ও পারসীদের সাম্রাজ্যের অংশ আছে। এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও পারসীদের পক্ষে উত্তর-ভারতীয় দীর্ঘদেহ সবলবাহু আর্য বীরদের পরাক্রম আলেকজাণ্ডার স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

আলেকজাণ্ডার বললেন, "আমি ভারত জয় করবো। পারস্য-সাম্রাজ্যের শেষ-চিহ্নও আর রাখবো না!"

সেনাপতিরা ভয় পেয়ে বললেন, "বলেন কি সম্রাট! সে যে

অনেক দূর! আপনার অবর্ত্তমানে গ্রীসে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হবে!"

আলেকজাণ্ডার কোনোদিন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না। অধীর স্বরে বললেন, "স্তব্ধ হও তোমরা! পারসীরা যা পেরেছে, আমার পক্ষে তা অসম্ভব নয়। আমি ভারত জয় করবো!"

যুবক দিগ্বিজয়ীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রাচীন সেনাপতিরা নীরবে মাথা নত করলেন।

কিন্তু আলেকজাণ্ডার কি সত্যসত্যই ভারত জয় করতে পেরেছিলেন? পঞ্চনদের তীরে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু মূলতানের যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি প্রায় মৃত্যু-মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এই ভারতেই তিনি যে প্রথম পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে বাধ্য হন, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই সে সম্বন্ধে নীরব। ভারত জয় না ক'রেই গ্রীকরা আবার স্বদেশের দিকে ফিরতে—বা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার ভারতের মাত্র এক প্রান্তে পদার্পণ করেছিলেন। এবং স্বদেশে প্রস্থান করবার সময়ে বড় বড় সেনাপতি ও অনেক সৈন্যসামন্ত উত্তর-ভারতের ঐ অধিকৃত অংশ রক্ষা করবার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব-ভারতের মহাবীরদের কবলে প'ড়ে তাদের যে অভাবিত দুর্দশা হয়, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরাও সে কাহিনী গোপন রাখতে পারেন নি। এ-সব কথা যথাসময়েই তোমাদের কাছে বলা হবে।

মনে রেখো, আলেকজাণ্ডারের যুগে ভারতে বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা তখন মূর্তি-পূজাও করতেন না, দেবমন্দিরও গড়তেন না। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, হিন্দু ও বৌদ্ধরা মূর্তি ও মন্দির গড়তে শেখেন গ্রীকদের কাছ থেকেই। এ কথা কতটা সত্য জানিনা, তবে গ্রীকদের ভারতে আসবার আগে বুদ্ধদেবের মূর্তি যে কেউ গড়েনি, সে-বিষয়ে কোনোও সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভিনেতা দিগ্বিজয়ী

মহাবীর আলেকজাণ্ডার! শতাব্দীর পর শতাব্দী যাঁর নাম-গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, প্রতীচ্যের যিনি প্রথম দিগ্বিজয়ী, এসিয়া, আফ্রিকা ও য়ুরোপে যাঁর প্রভাব আজও কেউ ভোলেনি, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কেমনধারা লোক ছিলেন? আগে সেই পরিচয়ই দিই।

বয়সে তিনি ছাব্বিশ বৎসর পার হয়েছেন মাত্র—যে-বয়সে নেপোলিয়নও পৃথিবীতে অপরিচিত এবং যে-বয়সে বাঙালীর ছেলে কলেজের বাইরেকার জগতে গিয়ে দাঁড়ালে প্রায় শিশুর মতোই অসহায় হয়ে পড়ে! এই ছাব্বিশ বৎসরের যুবক দিগ্বিজয়ী গ্রীস, মিশর, পারস্য ও বাবিলন প্রভৃতি দেশে জয়পতাকা উড়িয়ে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছেন ভারতবর্ষের দিকে।

দীর্ঘদেহ, বিরাটবক্ষ, গৌরবর্ণ,—বাল্যকাল থেকে নিয়মিত ব্যায়ামে দেহের প্রত্যেক মাংসপেশী স্পষ্ট ও লোহার মতোন শক্ত! মাথায় দুলছে সিংহের কেশরের মতো স্ফীত, কুঞ্চিত ও সুদীর্ঘ কেশমালা; প্রশস্ত ললাট—কিন্তু চুলের তলায় তার অধিকাংশ করেছে আত্মগোপন; মেঘের মতোন কালো ভুরুর ছায়ায় বড় বড় দুই চক্ষে মাঝে মাঝে জ্বলছে স্বপ্নসঙ্গীতের ইঙ্গিত; টানা, উন্নত নাক; দৃঢ়-সংবদ্ধ ওষ্ঠাধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব! এই বীর্যবান অথচ কমনীয় যুবকের দেহকে আদর্শ রেখে গ্রীক ভাস্কররা দেবতার মর্মর-মূর্তি গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। সে-সব মূর্তি আজও বিদ্যমান।

কিন্তু আলেকজাণ্ডার নিরেট কাঠ-গোঁয়ার যোদ্ধা ছিলেন না। অমর গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টোটল্ ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু! অস্ত্রচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মস্তিষ্কচালনাও করতে শিখেছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের চরিত্র ছিল অদ্ভুত। কখনো তিনি হ'তেন পাহাড়ের মতোন কঠোর, কখনো বজ্রের মতোন নিষ্ঠুর, আবার কখনো বা শিশুর মতোন কোমল! নিজেকে তিনি ভাবতেন সর্বশক্তিমান দেবতার মতো এবং সেইজন্যে অনেক সময়েই পৌরাণিক দেবতার পোষাক প'রে থাকতেন। এই অহমিকার জন্যেই আলেকজাণ্ডার যাত্রাপথের নানা স্থানে করেছিলেন নিজের নামে নব নব নগরের প্রতিষ্ঠা। অনেকের মতে, আফগানিস্থানের কান্দাহার সহরের নাম আলেকজান্দ্রিয়ারই অপভ্রংশ।

ভারতবর্ষ আক্রমণ করবার আগে, আশপাশের শত্রুনাশ ক'রে যাত্রাপথ সুগম করবার জন্যে আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ী রূপে প্রায় মধ্য-এসিয়ার বুক পর্যন্ত গিয়ে পড়েছিলেন—কোথাও কেউ তাঁর অগ্রগতিতে বাধা দিতে পারে নি।

আলেকজাণ্ডার যখন তুর্কীস্থানের বিখ্যাত সহর সমরখন্দে বিশ্রাম করছেন, সেই সময়েই আমরা প্রথম যবনিকা তুলবো।

শিবিরের এক অংশে একাকী ব'সে আলেকজাণ্ডার একমনে বই পড়ছেন।

বই পড়তে তিনি বড় ভালোবাসেন। স্বদেশ থেকে বহুদূরে এসে প'ড়ে, পথে-বিপথে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঘূর্ণী হাওয়ার মতো ছুটোছুটি ক'রে এতদিন তিনি বই পড়বার সময়ও পান নি এবং বইয়ের অভাবও ছিল যথেষ্ট। সংপ্রতি সে অভাব মিটেছে, গ্রীস থেকে তাঁর হুকুমে ঈস্কিলাস, এইরিপিদেস্ ও সোফোক্লেস্ প্রভৃতি কবি এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের রচিত নানারকম চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ এসে পড়েছে।

আলেকজাণ্ডার সানন্দে বই পড়তে পড়তে শুনতে পাচ্ছেন, শিবিরের বাহির থেকে মাঝে মাঝে জাগছে বুকেফেলাসের—অর্থাৎ 'ষণ্ডমুণ্ডে'র হ্রেষা-রব!

এই ষণ্ডমুণ্ড হচ্ছে আলেকজাণ্ডারের বড় আদরের ঘোড়া,—একে তিনি কখনো নিজের কাছ থেকে তফাতে রাখতেন না।

ষণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের কাহিনীও রীতিমত গল্পের মতো।

তাঁর পিতা ফিলিপ তখন মাসিডনিয়ার রাজা এবং আলেকজাণ্ডার তখন ছোট্ট এক বালক।

একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী মহা-তেজীয়ান এক ঘোড়া নিয়ে এল রাজা ফিলিপের কাছে বিক্রয় করতে।

ঘোড়াকে পরীক্ষা করবার জন্যে ফিলিপ তাঁর পল্টনের জনকয় পাকা ঘোড়-সওয়ারকে আহ্বান করলেন। কিন্তু কোনো সওয়ার তার পিঠে চড়বার চেষ্টা করলেই সেই তেজী ঘোড়া এমন ভয়ানক ক্ষেপে ওঠে যে, কেউ ভরসা ক'রে আর তার কাছে এগুতেই চাইলে না।

ফিলিপ বললেন, "এ তো ভারি বদ-মেজাজী ঘোড়া দেখছি! এ আপদ এখনি দূর ক'রে দাও।"

এতটুক ছেলে আলেকজাণ্ডার তখন এগিয়ে এসে বললেন, "মহারাজ, আপনার সওয়াররা ঘোড়া চেনে না তাই এমন চমৎকার ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারছে না।"

ফিলিপ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আলেকজাণ্ডার! তোমার ছোট-মুখে এত-বড় কথা শোভা পায় না! তুমি কি নিজেকে আমার সওয়ারদেরও চেয়ে পাকা ব'লে মনে করো?"

আলেকজাণ্ডার দৃঢ়স্বরে বললেন, "আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! আমি বাজি রেখে এখনি ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়তে রাজি আছি!"

পল্টনের পাকা ঘোড়-সওয়াররা শিশুর মুখ-সাবাসি শুনে সকৌতুকে অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

ফিলিপ বললেন, "বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখো।"

আলেকজাণ্ডার ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি এতক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করছিলেন যে, মাটির উপরে নিজের ছায়া দেখেই ঘোড়াটা চম্‌কে চম্‌কে উঠছে! তিনি প্রথমে পিঠ চাপড়ে তাকে আদর করলেন। তারপর লাগাম ধ'রে ঘোড়ার মুখটা সূর্যের দিকে ফিরিয়ে দিলেন, কাজেই সে আর নিজের ছায়া দেখতে পেলে না। তারপর অনায়াসেই ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে তাকে যথেচ্ছ ভাবে চারিদিকে ছুটোছুটি করিয়ে আনলেন।

বুড়ো বুড়ো সেপাই-সওয়ারদের মুখ চূণ, মাথা হেঁট!

ফিলিপ প্রথমটা বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন, তারপর অভিভূত স্বরে আলেকজাণ্ডারকে ডেকে বললেন "বাছা, নিজের জন্যে তুমি মস্ত কোনো রাজ্য জয় করো, আমার এ ক্ষুদ্র মাডিসন তোমার যোগ্য নয়!"

ফিলিপ সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ছেলে বড় সহজ ছেলে নয়! তাঁর অনুমানও সত্য হয়েছিল। কারণ ঐ ষণ্ডমুণ্ডেরই পিঠে চ'ড়ে আলেকজাণ্ডার পরে সারা বিশ্ব জয় করেছিলেন।

আজ শিবিরের বাইরে সেই ষণ্ডমুণ্ডই মাঝে মাঝে হ্রেষা-রব ক'রে তার প্রভুকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে, এতক্ষণ ধ'রে তাকে ভুলে থাকা উচিত নয়—মনিবকে পিঠে নিয়ে মাঠে-বাটে ছুটোছুটি করবার জন্যে তার পাগুলো নিস্‌পিস্ করছে যে! কিন্তু আলেকজাণ্ডার কাব্যরসে মগ্ন হয়ে তখন অন্য জগতে গিয়ে পড়েছেন—কল্পনাকে বিচরণ করা ছিল তাঁর চিরদিনের স্বভাব। এই কল্পনাই দেখিয়েছে তাঁকে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন!

কল্পনা চিরদিনই প্রত্যেক মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন লোক কেবল স্বপ্ন দেখেই খুসি থাকে, সেই স্বপ্নকে

সফল করবার জন্যে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে তারা চায় না। আলেকজাণ্ডারের প্রকৃতি ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। কাজে ফাঁকি দিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন না, স্বপ্নের মধ্যেই থাকত তাঁর নতুন নতুন কাজের বীজ।

আচম্বিতে শিবিরের বাইরে উঠল জনতার বিপুল কোলাহল, আলেকজাণ্ডার বই থেকে মুখ তুলে গোলমালের কারণ অনুমান করবার চেষ্টা করলেন।

শুনলেন, নানা কণ্ঠে চীৎকার হচ্ছে—"আমরা ভারতবর্ষে যেতে চাই না!"—"ভারতবর্ষ আক্রমণ ক'রে আমাদের কোনো লাভ নেই!" "কে জানে সেখানে আমাদের অদৃষ্টে কী আছে?"

আলেকজাণ্ডার সচমকে ভাবলেন,—একি বিদ্রোহ? তাঁর নিজের হাতে গড়া বহুযুদ্ধবিজয়ী এই মহাসাহসী গ্রীক সৈন্যদল, যাদের মুখ চেয়ে তিনি নিজে কত আত্মত্যাগ করেছেন, যারা তাঁরই দৌলতে কোনোওদিন পরাজয়ের মুখ দেখে নি,—তারাও আজ ভারতবর্ষের ভয়ে ভীত, তাঁর কথাও শুনতে নারাজ?

এই সেদিনের কথা তাঁর মনে পড়ল। প্রখর সূর্যকরে জ্বলন্ত এসিয়ার তপ্ত বুক মাড়িয়ে সসৈন্যে তিনি অগ্রসর হয়েছেন,—বাতাসে অগ্নিদাহের জ্বালা, জলবিন্দুশূন্য পথ আকাশের শেষ-সীমায় কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ জানে না, মাঝে মাঝে শুষ্ক শৈল, লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই!

কয়েকজন সৈনিক যখন একটি গর্তের মধ্যে একটুখানি জল আবিষ্কার করলে,—তখন সেই বিপুল বাহিনীর হাজার হাজার লোকের দেহ দারুণ পিপাসায় ছটফট করছে! চারিদিকে জলাভাবে হাহাকার!

ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ খুলে জনৈক সৈনিক জলটুকু সংগ্রহ করলে। কিন্তু সে জল একজনমাত্র লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়!

সৈনিক বললে, "এ জল মহারাজাকে উপহার দেবো। রাজার দাবি আমাদের আগে।"

সৈনিকরা জলপূর্ণ শিরস্ত্রাণ নিয়ে এল—আলেকজাণ্ডারের কণ্ঠ তখন তৃষ্ণায় টা-টা করছে।

মহারাজা সাগ্রহে তাড়াতাড়ি সৈনিকের হাত থেকে শিরস্ত্রাণ টেনে নিয়ে ঠোঁটের কাছে তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নজরে পড়ল, তৃষ্ণার্ত সৈনিকরা হতাশ ভাবে শিরস্ত্রাণের দিকে তাকিয়ে আছে!

আলেকজাণ্ডার ঠোঁটের কাছ থেকে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে ভাবলেন, 'সকলেরই ইচ্ছা জলটুকু পান করে, অথচ এ জল মাত্র একজনের যোগ্য। কিন্তু আমি রাজা ব'লে এই জল যদি পান করি, তাহ'লে এত লোকের তৃষ্ণার জ্বালা আরো বাড়িয়ে তোলা হবে!'

আলেকজাণ্ডার তখনি শিরস্ত্রাণ উপুড় ক'রে ধরলেন এবং দেখতে দেখতে শুক্‌নো মাটি তা নিঃশেষে শুষে নিলে।

মহারাজার উদারতা ও স্বার্থত্যাগ দেখে হাজার হাজার কণ্ঠ তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

আলেকজাণ্ডার সৈনিকদের কণ্ঠে এম্‌নি জয়ধ্বনি শুনতেই অভ্যস্ত ছিলেন,—কিন্তু তাদেরই কণ্ঠে জেগেছে আজ বিদ্রোহের বেসুরো চীৎকার!

বাপ যেমন ছেলেদের চেনে, আলেকজাণ্ডারও তেমনি তাঁর সৈন্যদের ধাত চিনতেন। কাজেই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হয়ে তখনি তিনি তাঁবুর বাইরে গিয়ে দেখলেন সেখানে অনেক গ্রীক এসে বৃহৎ এক জনতার সৃষ্টি করেছে এবং তাদেরই পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর অদ্বিতীয় বন্ধু ক্লিটাস্।

বন্ধু ক্লিটাস্—জীবন-রক্ষক ক্লিটাস্! আলেকজাণ্ডারের মনে পড়ল ছয় বৎসর আগেকার একদিনের কথা! গ্রানিকাশের রণক্ষেত্রে যখন দুইজন পারসী সেনাপতি একসঙ্গে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং যখন তাদের উদ্যত অস্ত্রের কবল থেকে আলেক-জাণ্ডারের মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই ছিল না, তখন এই মহাবীর ক্লিটাসই সেখানে আবির্ভূত হয়ে সিংহবিক্রমে তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। সেই দিন থেকেই ক্লিটাস্ হয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আলেকজাণ্ডার তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি, ক্লিটাস্?"

ক্লিটাস্ বললেন, "সৈন্যরা কেউ ভারতবর্ষে যেতে রাজি নয়।"

—"কেন?"

—"ওরা বলছে, গৌগেমেলার রণক্ষেত্রে দরায়ুসের সেনাদলে ওরা ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ করতে দেখেছে। দূর বিদেশে পরের জন্যে

তরবারি ধ'রে সেই কয় শত ভারতীয় বীর যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, ওদের আজও তা মনে আছে। আজ আমরা চলেছি তাদেরই স্বদেশে—যেখানে সংখ্যায় হবো আমরা তুচ্ছ, আর তারা হবে অগণ্য। ওরা তাই ভয় পেয়েছে, হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে শত শত নদী, বন, পাহাড়ের ওপারে সেই দুর্গম ভারতবর্ষে যাবার ইচ্ছা ওদের নেই।"

আলেকজাণ্ডার ঘৃণাভরে বললেন, "গ্রীক সেনার ভয়! দেবাশ্রিত আমার সৈন্য, ভারতবর্ষের নামে তাদের ভয় হয়েছে! ক্লিটাস্, তুমিও কি ওদের দলে?"

—"হাঁ সম্রাট! আমারও মত হচ্ছে, এই মিথ্যা দুঃসাহস দেখিয়ে আমাদের কোনোই লাভ হবে না!"

আলেকজাণ্ডার পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "শোনো ক্লিটাস্! শোনো সৈন্যগণ! আমাদের আর ফেরবার কোনোও উপায়ই নেই। আমাদের স্বদেশ আজ বহুদূরে, আমাদের চতুর্দিকে আজ বিদেশী শত্রু! আমরা যদি আজ দেশের দিকে ফিরি, তাহ'লে শত্রুরা ভাববে আমরা তাদের ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছি। আজ আমাদের বাহুবল দেখে যে লক্ষ লক্ষ শত্রু মাথা লুকিয়ে আছে, তারা তখন চারিদিক থেকে পঙ্গপালের মতো বেরিয়ে গ্রীক সৈন্যদের আক্রমণ ক'রে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলবে। শত্রুর শেষ রেখে ফিরতে গেলে আমাদের কারুকে আর বাঁচতে হবে না। বিশেষ, ভারতবর্ষ হচ্ছে পারস্য-সাম্রাজ্যের অংশ, এখন তাকে জয় করতে না পারলে আমাদের দিগ্বিজয়ও ব্যর্থ হয়ে যাবে!"

ক্লিটাস্ বললেন, "কিন্তু ভারতবর্ষে গিয়ে তাকে জয় করতে না পারলে আমাদের কি অবস্থা হবে?"

আলেকজাণ্ডার ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "সে কথা ভাববো আমি। তোমাদের কর্তব্য আমার আদেশ পালন করা।"

ক্লিটাস্ বললেন, "নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আপনার আদেশ পালন করতে হবে ?"

—"হাঁ, সেইটেই হচ্ছে সৈনিকের ধর্ম। মৃত্যুর চেয়েও বড় সেনাপতির আদেশ।"

হাজার হাজার সৈনিক হঠাৎ একসঙ্গে ব'লে উঠল, "অন্ধের মতো আমরা কারুর আদেশ পালন করবো না—আমরা কেউ ভারতবর্ষে যাবো না।"

কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়ে যাঁরা খেলা করতে পারেন, জনতার হৃদয় জয় করবার অনেক কৌশলই তাঁদের জানা থাকে।

আর একজন দিগ্বিজয়ী—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, মিষ্টি কথায় কারুকে বশ করতে না পারলে পাগলের মতন ক্ষেপে উঠতেন এবং তাঁর সেই প্রচণ্ড রাগ দেখে অবাধ্যরা মুসড়ে প'ড়ে বাধ্য না হয়ে পারত না। অথচ নেপোলিয়ন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার ক'রে গেছেন, সে-সব রাগ তাঁর লোক-দেখানো মৌখিক অভিনয় মাত্র, মনে মনে হেসে বাইরে তিনি করতেন ক্রোধ প্রকাশ !

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারও ছিলেন অভিনয়ে খুব পটু। ক্রুদ্ধ স্বরেও যখন ফল হ'ল না, তখন তিনি ভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। অত্যন্ত নিরাশ ভাবে দুঃখে-ভাঙা স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "সৈন্যগণ ! আমি সম্রাট বটে, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে করেছি বন্ধুর মতো আচরণ ! তোমাদের জন্যে আমি আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল এগিয়ে দিয়েছি, তোমাদের গৌরবের জন্যে আমি সিংহাসনের বিলাসিতা ছেড়ে বারবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ছুটে গিয়েছি। তোমরা কেবল আমার বন্ধু নও, আমার সন্তানের মতো। তোমাদের কোনো প্রার্থনাই আমি অপূর্ণ রাখতে পারবো না। ভারতবর্ষ জয় করা ছিল আমার উচ্চাকাঙ্খা, কিন্তু তোমরা যখন অসম্মত, তখন আমারও রাজি না হয়ে উপায় নেই। বেশ, তোমরা যা চাও তাই হবে।

আজ থেকে আমিও আর তোমাদের সেনাপতি নই—তোমরাও হ'লে স্বাধীন! আমি তোমাদের ত্যাগ করলুম, আমাকে এখানে একাকী রেখে তোমরা গ্রীসে ফিরে যাও। আমার আর কোনও বক্তব্য নেই"—বলতে বলতে তাঁর তুই চোখ ছল্‌-ছলে ও কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল।

বীরত্বের অবতার ও গ্রীসের সর্বে-সর্বা সম্রাট আলেকজাণ্ডারের এই কাতর দীনতা ও আর্তস্বর সৈন্যরা সহ্য করতে পারলে না, তারা এককণ্ঠে ব'লে উঠল, "সম্রাট—সম্রাট! আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন না, আপনার সঙ্গে আমরা মৃত্যুর মুখেও ছুটে যেতে প্রস্তুত! আমরা ভারতবর্ষে যাবো—আমরা ভারতবর্ষে যাবো!"

আলেকজাণ্ডারের মুখে আবার হাসির রেখা ফুটল, উচ্ছ্বসিত স্বরে তিনি বললেন, "এই তো আমার সৈন্যদের যোগ্য কথা! ক্লিটাস্, হতভম্বের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? যাও, আমার সৈন্যদের জন্যে আজ বিরাট এক ভোজের আয়োজন করো গে! কালই আমরা ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করবো।"

হাজার হাজার সৈন্যের মুখ থেকে তখন বিদ্রোহের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তারা একসঙ্গে অসি কোষমুক্ত ক'রে শূন্যে আস্ফালন করতে করতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ব'লে উঠল, "জয়, সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জয়! ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! পঞ্চনদের তীরে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের জয়!

আলেকজাণ্ডার আদেশ দিয়েছেন, সমরখন্দে গ্রীকদের শিবিরে শিবিরে তাই আজ উঠেছে বিপুল উৎসবের সাড়া।

পানাহার, নাচ, গান, বাজনা, কৌতুক ও খেলাধূলা চলেছে অশ্রান্ত ভাবে—সৈনিকদের নিশ্চিন্ত ছেলেমানুষি দেখলে কে আজ বলবে যে, এদের ব্যবসা হচ্ছে অকাতরে নিজের জীবন দেওয়া ও পরের জীবন নেওয়া!

আলেকজাণ্ডারের বৃহৎ শিবির আজ লোকে লোকারণ্য। সৈন্যদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁরা সবাই সেখানে এসে আমোদ-আহ্লাদ করছেন। সেকালকার গ্রীকদের ভোজসভার একটি ছোট্ট ঐতিহাসিক ছবি এখানে এঁকে রাখলে মন্দ হবে না।

শিবিরের মাঝখানে রয়েছে খান-কয় রৌপ্যখচিত কাঠের কৌচ—কাঠের গায়ে রঙিন নক্সা। কৌচের উপরে 'কুশন' বা তাকিয়ায় ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে বা অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছেন অতিথিরা। এমনি অর্ধশায়িত অবস্থায় পানাহার করতে শিখেছেন এঁরা পারসী প্রভৃতি প্রাচ্য জাতির কাছ থেকেই। কৌচের সামনে আছে আরো-নীচু কতকগুলো ছোট টেবিল, তাদের পায়াগুলো হাতীর দাঁতে তৈরী। এই-সব ছোট টেবিলের উপরে খাবার-দাবার ও পানপাত্র সাজানো।

গ্রীকরা সেকালে ছিল অতিরিক্ত-রূপে মাংসপ্রিয়। তারা মাছও খেত, তবে মাংসের কাছে মাছকে তুচ্ছ ব'লে মনে করত। শাকসব্জী ব্যবহার করত খুব কম। মদ খাওয়া তাদের কাছে দোষনীয় ছিল না, প্রকাশ্যেই সবাই মদ্যপান করত। মদের সঙ্গে খেত পেঁয়াজ।

আলেকজাণ্ডারের হাতে রয়েছে একটি চিত্রিত পানপাত্র, সেটির গড়ন ষাঁড়ের মাথার মতন। সাম্‌নেই দুটি সুন্দরী মেয়ে মিষ্টি সুরে বাঁশী বাজাচ্ছে এবং আর একটি রূপসী মেয়ে তারই তালে তালে করছে নৃত্য। আলেকজাণ্ডার মদ্যপান করতে করতে একমনে নাচ দেখছেন।—প্রাচীন গ্রীকরা নাচ-গান বড় ভালোবাসত।

সুগন্ধ জলে পূর্ণ পাত্র নিয়ে দলে দলে রাজভৃত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই জলে হাত ধুয়ে অতিথিরা আসন গ্রহণ করছেন। তাঁরা তরকারি বা ঝোল মাখা হাত মুছবেন ব'লে প্রত্যেক টেবিলেই নরম রুটি সাজানো রয়েছে। রুটিতে হাত মোছবার নিয়ম য়ুরোপে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল।

হঠাৎ আলেকজাণ্ডারের দৃষ্টি ক্লিটাসের দিকে আকৃষ্ট হ'ল। ক্লিটাস্ গম্ভীর ভাবে কৌচের উপরে ব'সে আছেন। তাঁর মুখে কালো ছায়া।

আলেকজাণ্ডার বললেন, "বন্ধু, অমন মুখ গোম্‌রা ক'রে ভাবছ কি?"

ক্লিটাস্ তিক্ত হাসি হেসে বললেন, "ভাবছি কি? ভাবছি আজ তুমি কি অভিনয়টাই করলে!"

ভুরু কুঁচ্‌কে আলেকজাণ্ডার বললেন, "অভিনয়?"

—"হাঁ, হাঁ, অভিনয়! তোমার চমৎকার অভিনয়ে নির্বোধ সৈন্যরা ভুলে গেল বটে, কিন্তু আমি ভুলি নি। নিজের যশ বাড়াবার জন্যে তুমি চলেছ ভারতবর্ষের দিকে, আর তোমার যশ বাড়াবার জন্যে আমরা চলেছি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে!"

আত্মসংবরণ করবার জন্যে আলেকজাণ্ডার আবার মদ্যপান ক'রে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন, কারণ তাঁর রাগী মেজাজ তখন গরম হয়ে উঠেছে। ক্লিটাস্ তাঁর প্রিয়তম বন্ধু বটে, কিন্তু ভুলে যাচ্ছে তিনি সম্রাট!

ক্লিটাস্ আবার ব্যঙ্গভরে বললেন, "আলেকজাণ্ডার, রণক্ষেত্র ছেড়ে নাট্যশালায় চাকরি নিলে তুমি আরো বেশী যশস্বী হ'তে পারবে,—বুঝেছ ?"

ক্রোধে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে আলেকজাণ্ডার বললেন, "ক্লিটাস্—ক্লিটাস্! চুপ করো!"

—"কেন চুপ করবো ? জানো আমি তোমার জীবনরক্ষক ? গ্রানিকাশের যুদ্ধের কথা কি এখনি ভুলে গেছ ? আমি না থাকলে পারসীরা তো সেই দিনই তোমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলত, তারপর কোথায় থাকত তোমার দিগ্বিজয়ের দুঃস্বপ্ন ? শঠ, কপট, নট! আমাদের প্রাণ নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলতে চাও ?

—"ক্লিটাস্!"

—"থামো থামো, আমি তোমার চালাকিতেও ভুলবো না, তোমার চোখরাঙানিকেও ভয় করবো না!"

অন্যান্য সেনাপতিরাও প্রমাদ গুণে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, "ক্লিটাস্, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? তুমি কাকে কি বলছ ? উনি যে আমাদের সম্রাট!"

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ক্লিটাস্ বললেন, "যাও, যাও! আলেকজাণ্ডার তোমাদের সম্রাট হ'তে পারে, কিন্তু আমার কেউ নয়! আমি ওর আদেশ মানবো না!"

মদের বিষ তখন আলেকজাণ্ডারের মাথায় চড়েছে, সকলের সামনে এত অপমান আর তিনি সইতে পারলেন না। দুর্জয় ক্রোধে বিষম এক হুঙ্কার দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং চোখের পলক পড়বার আগেই পাশ থেকে একটা বর্শা তুলে নিয়ে ক্লিটাসের বুকে আমূল বসিয়ে দিলেন! ক্লিটাসের দেহ গড়িয়ে মাটির উপরে প'ড়ে গেল, দুই একবার ছট্‌ফট্ করলে, তারপরেই সব স্থির!

এই কল্পনাতীত দৃশ্য দেখে সকলেই বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলেন—থেমে গেল বাঁশীর তান, গায়কের গান, নর্তকীর নাচ, উৎসবের আনন্দধ্বনি !

আলেকজাণ্ডার পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত চোখে

দেখলেন, ক্লিটাসের নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহের উপর দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে!

দেখতে দেখতে আলেকজাণ্ডারের নিষ্পলক বিস্ফারিত চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তারপরেই শিশুর মতন ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি ব'লে উঠলেন, "ক্লিটাস্—ভাই, আমার জীবন-রক্ষক! কথা কও বন্ধু, কথা কও!"

কিন্তু ক্লিটাস্ আর কথা কইলেন না।

ক্লিটাসের বুকে তখনও বর্শাটা বিঁধে ছিল। আলেকজাণ্ডার হঠাৎ হেঁট হয়ে প'ড়ে বর্শাটা দুই হাতে উপ্ড়ে তুলে নিয়ে নিজের বুকে বিদ্ধ করতে উদ্যত হলেন।

একজন দেহরক্ষী এক লাফে কাছে গিয়ে বর্শাশুদ্ধ তাঁর হাত চেপে ধরলে। সেনাপতিরাও চারিদিক থেকে হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এলেন।

আলেকজাণ্ডার ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে পাগলের মতন ব'লে উঠলেন, "না—না! আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও! যে বন্ধু আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, আমি তাকেই হত্যা করেছি! আমি মহাপাপী! আমার মৃত্যুই শ্রেয়!"

প্রধান সেনাপতি বৃদ্ধ পার্মেনিও, তিনি আলেকজাণ্ডারের পিতা রাজা ফিলিপের আমলের লোক। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "বাছা আলেকজাণ্ডার, তুমি ঠাণ্ডা হও। যা হয়ে গেছে তা শোধ্‌-রাবার আর উপায় নেই। তুমি আত্মহত্যা করলে কোনই লাভ হবে না।"

আলেকজাণ্ডার কাতর স্বরে বললেন, "আত্মহত্যা ক'রে আমি ক্লিটাসের কাছে যেতে চাই।"

পার্মেনিও বললেন, "তুমি আত্মহত্যা করলে গ্রীসের কি হবে? এই বিপুল সৈন্যবাহিনী কে চালনা করবে? কে জয় করবে দুর্ধর্ষ

ভারতবর্ষকে? তোমারি উচ্চাকাঙ্খা ছিল সারা পৃথিবী জয় করা—আমাদের স্বদেশ গ্রীসের গৌরব বর্ধন করা! আলেকজাণ্ডার, গ্রীস যে তোমাকে ছাড়তে পারে না, তার প্রতি তোমার কি কর্তব্য নেই?"

পার্মেনিও ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছিলেন, আলেকজাণ্ডার আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে দৃঢ় স্বরে ব'লে উঠলেন, "ঠিক বলেছেন সেনাপতি, স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য আছে—আমি আত্মহত্যা করলে গ্রীস পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হ'তে পারবে না। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এখন ভারতবর্ষ জয় করা! এত দূরে এসে, এত রক্তপাত ক'রে আমাদের ফেরা চলে না! সেনাপতি, আপনি এখনি বাইরে গিয়ে আমার নামে হুকুম দিন, সৈন্যরা ভারতবর্ষে যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হোক!"

সম্রাটের মন ফিরেছে দেখে, পার্মেনিও সানন্দে শিবিরের বাইরে খবর দিতে ছুটলেন।

অনতিবিলম্বেই হাজার হাজার সৈনিকের সম্মিলিত কণ্ঠে সমুদ্র-গর্জনের মতো শোনা গেল—"ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!"

রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল তিনজন অশ্বারোহী সৈনিক—সুবন্ধু, চিত্ররথ, পুরঞ্জন। নাম শুনে বিস্মিত হবার দরকার নেই, কারণ তারা ভারতের ছেলে। সেই গৌরবময় যুগে ভারতের বীর ছেলেরা তরবারি সম্বল ক'রে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে সুদূর পারস্য ও তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশেও যেতে ইতস্তত করত না, ইতিহাসেই সে সাক্ষ্য আছে। কালিদাসের কাব্যেও দেখবে, রাজা রঘু ভারতের মহাবীরদের নিয়ে পারসী ও হুনদের দেশে গিয়ে হাজার হাজার শত্রুনাশ ক'রে এসেছেন। সুবন্ধু, চিত্ররথ ও পুরঞ্জন সেই ডানপিটেদের দলেরই তিন বীর। গ্রীক বাহিনীর মিলিত কণ্ঠে ভারতবর্ষের নাম শুনে তারা সবিস্ময়ে ঘোড়াদের থামিয়ে ফেললে।

একজন গ্রীক সৈনিক উত্তেজিত ভাবে শিবিরের দিকে যাচ্ছে দেখে সুবন্ধু বললে, "ওহে বন্ধু, কোথা যাও? তোমাদের সৈন্যরা কি আজ বড্ড বেশী মাতাল হয়ে পড়েছে? তারা 'ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ' ব'লে অত চ্যাঁচাচ্ছে কেন?"

গ্রীক সৈনিক ব্যস্ত স্বরে বললে, "এখন গল্প করবার সময় নেই। সম্রাট হুকুম দিয়েছেন, এখনি আমাদের শিবির তুলতে হবে।"

—"কেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

গ্রীক সৈনিক গর্বিত স্বরে বললে, "আমরা ভারতবর্ষ জয় করতে যাচ্ছি"—বলেই দ্রুতপদে চ'লে গেল।

সুবন্ধু বললে, "সর্বনাশ!"

পুরঞ্জন বললে, "এও কি সম্ভব?"

সুবন্ধু বললে, "আলেকজাণ্ডারকে দিগ্বিজয়ের নেশা পেয়ে বসেছে। তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

চিত্ররথ বললে, "ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। এ দুঃসংবাদ সেখানে কেউ এখনো শোনে নি।"

পুরঞ্জন শুষ্কস্বরে বললে, "দুর্জয় গ্রীকবাহিনী, অপ্রস্তুত ভারতবর্ষ! এখন আমাদের কর্তব্য?"

সুবন্ধু কিছুক্ষণ নীরবে গ্রীক শিবিরের কর্ম-ব্যস্ততা লক্ষ্য করতে লাগল—তার দুই ভুরু সঙ্কুচিত, কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। কোনো গ্রীক তাঁবুর খোঁটা তুলছে, কেউ ঘোড়াকে সাজ পরাচ্ছে, কেউ নিজে পোষাক পরছে, সেনাপতিরা হুকুম দিচ্ছেন, লোকজনেরা ছুটাছুটি করছে!

চিত্ররথ বললে, "এখনি বিরাট ঝটিকা ছুটবে ভারতবর্ষের দিকে। আমরা তিনজন মাত্র, এ ঝড়কে ঠেকাবো কেমন ক'রে?"

সুবন্ধু হঠাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে বললে, "চলো চিত্ররথ! চলো

পুরঞ্জন! এই ঝটিকাকে পিছনে—অনেক পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে দূর-দূরান্তরে!”

—“দূর-দূরান্তরে! কোথায়?”

—আমাদের স্বদেশে—ভারতবর্ষে! ঝটিকা সেখানে পৌঁছবার আগেই আমরা গিয়ে ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলবো!”

ওদিকে অগণ্য গ্রীক-কণ্ঠে জলদগম্ভীর চীৎকার জাগলো—“জয় জয়, আলেকজাণ্ডারের জয়!”

সুবন্ধু, চিত্ররথ ও পুরঞ্জন একসঙ্গে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে প্রাণপণ চীৎকারে ব'লে উঠল, “জয় জয়, ভারতবর্ষের জয়!”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম ও দ্বিতীয় বলি

—"জয় জয়, ভারতবর্ষের জয়।"

সেই পূর্ণ-কণ্ঠের জয়ধ্বনি প্রবেশ করল আলেকজাণ্ডারের শিবিরের মধ্যে।

তারপরই সম্মিলিত গ্রীক-কণ্ঠে জাগল আবার সেই সমুদ্রগর্জনের মতো গম্ভীর ধ্বনি—"জয় জয়, আলেকজাণ্ডারের জয়!"

আলেকজাণ্ডার ভারতের ভাষা জানতেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার সৈন্যদের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় কারা চীৎকার ক'রে কী বলছে?"

তখনি দোভাষী এসে জানালে, "তিনজন ভারতের সৈনিক এখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ভারত আক্রমণ করতে যাবো শুনে তারা ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।"

আলেকজাণ্ডার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য ওদের সাহস! মাত্র ওরা তিনজন, অথচ আমার সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে!"

—"সম্রাট, ওরা দাঁড়িয়ে নেই,—বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে চীৎকার করছে!"

দুই ভুরু কুঁচ্‌কে আলেকজাণ্ডার খানিকক্ষণ ধ'রে কি ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা কোন দিকে গেল?"

—"দক্ষিণ দিকে।"

—"দক্ষিণ দিকে ? তার মানে ভারতবর্ষের দিকে !" আলেকজাণ্ডার হঠাৎ এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চীৎকার ক'রে বললেন, "তেজী ঘোড়ায় চ'ড়ে আমার সৈনিকেরা এখনি ওদের পিছনে ছুটে যাক ! ওদের বন্দী করো ! ওদের বধ করো ! নইলে আমরা মহাবিপদে পড়বো !"

হুকুম প্রচার করবার জন্যে দোভাষী তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল। আলেকজাণ্ডার অস্থির চরণে শিবিরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বললেন, "আমার সৈন্যরা মূর্খ ! কেন তারা ওদের ছেড়ে দিলে ?"

কয়েকজন গ্রীক সেনানী সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন, "সম্রাট, তুচ্ছ কারণে আপনি এতটা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? ঐ তিনজন মাত্র পলাতক সৈনিক আমাদের কী অপকার করতে পারে ?"

আলেকজাণ্ডার বললেন, "তোমরাও কম মূর্খ নও ! এই কি তুচ্ছ কারণ হ'ল ? বুঝতে পারছ না, আমাদের এই অভিযানের কথা ভারত যত দেরিতে টের পায়, ততই ভালো ! শত্রুদের প্রস্তুত হ'তে অবসর দেওয়া যে আত্মহত্যার চেষ্টার মতো ! সারা ভারত যদি অস্ত্রধারণ করবার সময় পায়, তা'হলে আমাদের অবস্থা কী হবে ? ঐ তিনজন সৈনিক ভারতে ছুটে চলেছে তাদের স্বদেশকে সাবধান করবার জন্যে ! বন্দী করো, তাদের বধ করো, তাদের কণ্ঠরোধ করো !"

—সম্রাট, এখান থেকে ভারত শত-শত ক্রোশ দূরে ! সেখানে যাবার আগেই পলাতকরা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে !"

* * *

"সত্যই তাই ! সমরখন্দ এবং ভারতবর্ষ ! তাদের মাঝখানে বিরাজ করছে শত-শত ক্রোশ ব্যাপী পথ ও বিপথের মধ্যে আমু-

দরিয়া প্রভৃতি নদী, হিন্দুকুশ প্রভৃতি পর্বত, বিজন অরণ্য, বৃহৎ মরু-প্রান্তর এবং আরো কত কি বিষম বাধা! এত বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে দুর্গম পথের তিন যাত্রী কি আবার তাদের স্বদেশের আশ্রয়ে ফিরে আসতে পারবে? কত সূর্য ডুববে, কত চন্দ্র উঠবে, কত তারকা ফুটবে, বাতাস কখনো হবে আগুনের মতো গরম ও কখনো হবে তুষারের মতো শীতল, আকাশ কখনো করবে বজ্রপাত এবং কখনো পাঠিয়ে দেবে প্রবল ঝঞ্ঝার দলবল, বনে বনে গর্জন ক'রে জাগবে হিংস্র জন্তুরা, আনাচে-কানাচে অতর্কিতে আবির্ভূত হবে তাদের চেয়ে আরো নিষ্ঠুর দস্যুরা এবং সেই সঙ্গে তাদের লক্ষ্য ক'রে ধেয়ে আসছে দৃঢ়-পণ নিয়ে ত্রিশজন অশ্বারোহী গ্রীক সৈনিক! ভারতের ছেলে আর কি ভারতে ফিরবে?

শেষোক্ত বিপদের কথা আগে তারা টের পায় নি। প্রত্যাবর্তন আরম্ভ ক'রে তাদের বেগবান অশ্বেরা অনেকখানি পথ এগিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছিল। ত্রিশজন গ্রীক সৈনিক সাজসজ্জা ক'রে বেরুতেও কম সময় নেয়নি। ভারতের তিন ভাগ্যান্বেষী বীর স্বদেশে ফেরবার পথ-ঘাটও ভালো ক'রে জানত, গ্রীকদের যা জানা ছিল না। তিনজন ভারতবাসী কখন্ কোন্ পথ অবলম্বন করছে, গ্রামে গ্রামে দাঁড়িয়ে প'ড়ে সে খবর সংগ্রহ করতেও গ্রীকদের যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু গ্রীকরা নিশ্চিত ভাবেই তিন বীরের পিছনে এগিয়ে চলেছে। কেবল তাই নয়, তারা ক্রমেই তাদের নিকটস্থ হচ্ছে।

সেদিন সকালে আমু-দরিয়া নদী পার হয়ে তিন বন্ধুতে বিশ্রাম করছিল।

হঠাৎ সুবন্ধু চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠে নদীর পরপারে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে চিত্ররথ ও পুরঞ্জনও দেখলে, একখানা ধূলোর মেঘ নদীর ওপারে এসে থেমে পড়ল।

ধীরে ধীরে ধূলোর মেঘ উড়ে গেল এবং সেই সঙ্গেই দেখা গেল, একদল অশ্বারোহী সৈনিকের উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ ও বর্মের উপরে প'ড়ে ঝক্‌মক্ ক'রে উঠছে প্রভাতের সূর্যকিরণ!

সুবন্ধু সচকিত কণ্ঠে বললে, "গ্রীক সৈন্য!"

চিত্ররথ বললে, "ওরা পার-ঘাটে গিয়ে ঘোড়া থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল! ওরা নদী পার হ'তে চায়!"

পুরঞ্জন বললে, "এত শীঘ্র অত-বড় শিবির তুলে ওরা কি অভিযান আরম্ভ ক'রে দিয়েছে?"

সুবন্ধু ঘাড় নেড়ে বললে, "আসল বাহিনী হয়তো শিবির তোলবার চেষ্টাতে এখনো ব্যস্ত হয়ে আছে।"

—"তবে কি ওরা অগ্রবর্তী রক্ষীর দল?"

—"হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওরা আমাদেরই খুঁজছে। নইলে ওরা প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এসেছে কেন? এ পথ তো ভারতে যাবার পথ নয়—এ পথ তো কেবল আমাদের মতো সন্ধানী লোকেরাই জানে! ওরা নিশ্চয় আমাদের উদ্দেশ্য ধ'রে ফেলেছে—ওরা নিশ্চয় আমাদের বন্দী করতে এসেছে!"

—"কিন্তু আমরা বন্দী হবো না। নদীপার হ'তে ওদের সময় লাগবে। ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো। ভারতে যাবার কত পথ আছে, সব পথ ওরা জানবে কি ক'রে?

—"ঘোড়ায় চড়ো, ঘোড়ায় চড়ো! ভারত এখনো বহু দূর—

তিন বীরকে পিঠে নিয়ে তিন ঘোড়া ছুটল আবার ভারতের দিকে।

ওপারে গ্রীকদের ব্যস্ততা আরো বেড়ে উঠল, মুখের শিকার আবার হাতছাড়া হ'ল দেখে।

আবার দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। দিক-চক্রবাল-রেখার উপরে ফুটে উঠল হিন্দুকুশের মর্মভেদী শিখরমালা। গ্রীকরা হতাশ হয়, তিন ভারত-বীরের চোখে জ্বলে আশার আলো। হিন্দুকুশের অন্দরে গিয়ে ঢুকতে পারলে কে আর তাদের নাগাল ধরতে পারবে? হিন্দুকুশের ওপার থেকে ডাকছে তাদের মহা-ভারতের প্রাচীন আত্মা! স্বদেশগামী ঘোড়াদের খুরে খুরে জাগছে বিদ্যুৎগতির ছন্দ!

বিস্তীর্ণ এক সমতল প্রান্তর—একান্ত অসহায়ের মতো দুপুরের রোদের আগুনে প'ড়ে প'ড়ে দগ্ধ হচ্ছে। প্রান্তরের শেষে একটা বেশ-উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে। তিন ঘোড়া পাশাপাশি ছুটছে সেই দিকেই।

পাহাড়ের খুব কাছে এসে হঠাৎ পুরঞ্জনের ঘোড়া প্রথমে দাঁড়িয়ে—তারপর মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। দু-একবার ছট্‌ফট্ ক'রেই একেবারে স্থির!

পুরঞ্জন মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে ব'সে ঘোড়াকে পরীক্ষা করতে লাগল, সুবন্ধু ও চিত্ররথও নিজের নিজের ঘোড়া থেকে নামল।

মৃতের মতো বর্ণহীন মুখ ঊর্ধ্বে তুলে পুরঞ্জন অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "আমার ঘোড়া এ-জীবনে আর উঠবে না!"

সুবন্ধু বললে, "এখন ঘোড়া যাওয়ার মানেই হচ্ছে, শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া। আমাদেরও ঘোড়ার অবস্থা ভালো নয়। এদের কোনটাই দুজন সওয়ার পিঠে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারবে না।"

চিত্ররথ পিছন দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত ক'রে ত্রস্ত স্বরে বললে, "ওদিকে চেয়ে দেখো—ওদিকে চেয়ে দেখো!"

সকলে সভয়ে দেখলে, দূর অরণ্যের বক্ষ ভেদ ক'রে একে একে বেরিয়ে আসছে গ্রীক সৈনিকের পর গ্রীক সৈনিক। তাদের দেখেই তারা উচ্চস্বরে জয়নাদ ক'রে উঠল!

সুবন্ধু ব্যস্তভাবে বললে, "কি করি এখন? পুরঞ্জনকে এখানে ফেলে রেখে কি ক'রেই বা আমরা পালিয়ে যাই?"

পুরঞ্জন দৃঢ়স্বরে বললে, "শোনো সুবন্ধু! আমি এক উপায় স্থির করেছি। এখন এই উপায়ই হচ্ছে একমাত্র উপায়।"

গ্রীকরা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুততর বেগে এগিয়ে আসছে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে সুবন্ধু বললে, "যা বলবার শীঘ্র বলো। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বন্দী হ'তে হবে"।

পুরঞ্জন সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস টেনে বুক ফুলিয়ে বললে, "ভারতের ছেলে এত সহজে বন্দী হয় না! শোনো সুবন্ধু! সামনের উঁচু পাহাড় আর পিছনে গ্রীক সৈন্য—ঘোড়া ছুটিয়েও আমরা আর কোথাও পালাতে পারবো না! কিন্তু পাহাড়ের ঐ সরু পথটা দেখছ তো? পাশাপাশি দুজন লোক ও-পথে উপরে উঠতে পারে না! চলো, ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে ঐ পথে আমরা উপরে গিয়ে উঠি। গ্রীকদেরও ঘোড়া ছেড়ে ঐ পথেই এক-একজন ক'রে উঠতে হবে। আমি আর চিত্ররথ পাহাড়ে উঠে ঐ পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে শত্রুদের বাধা দেবো।"

সুবন্ধু বিস্মিত স্বরে বললে, "আর আমি?"

—"ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে তুমি ছুটে যাও ভারতের দিকে। তুমি একলা দু-চারদিন লুকিয়ে এগুতে পারবে। তারপর নতুন তাজা ঘোড়া কিনে যথাসময়ে ভাঙিয়ে দেবে ভারতের নিশ্চিন্ত নিদ্রা।"

—"আর তোমরা?"

—"যতক্ষণ পারি শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখবো। তারপর স্বদেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দেবো।"

—"সে হয় না পুরঞ্জন! স্বদেশের জন্যে প্রাণ দেবার আনন্দ থেকে আমিই বা বঞ্চিত হবো কেন?"

পুরঞ্জন কর্কশ স্বরে বললে, "প্রতিবাদ কোরো না সুবন্ধু, এখন কথা-কাটাকাটির সময় নেই। গ্রীকরা যাচ্ছে ভারতবর্ষে, স্বদেশের জন্যে প্রাণ দেবার অনেক সুযোগ তুমি পাবে! এখন সব-চেয়ে বড় কর্তব্য তুমি পালন করো, শত্রুদের আমরা বাধা দিই।—চিত্ররথ! তুমি নীরব কেন? তোমার কি ভয় হচ্ছে?"

চিত্ররথ সদর্পে বললে, "ভয়! ক্ষত্রিয় মরতে ভয় পায়? আমি চুপ ক'রে আছি—কারণ মৌনই হচ্ছে সম্মতির লক্ষণ!"

পুরঞ্জন তরবারি কোষমুক্ত ক'রে পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে, "তা'হলে এসো আমার সঙ্গে! বলো—জয়, ভারতবর্ষের জয়!"

ভারতবর্ষের নামে জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ ক'রে তিনজন ভারত-সন্তান সাম্‌নের পাহাড়ের দিকে বেগে ছুটে চলল। সেখানে গিয়ে পৌঁছেই সুবন্ধু বুঝলে, পুরঞ্জন ভুল বলে নি, এই সরু পথ রুখে দাঁড়ালে দুজন মাত্র লোক অনেকক্ষণ ধ'রে বহু লোককে বাধা দিতে পারবে!

প্রায় সত্তর-আশী ফুট উপরে গিয়ে পথটা আবার আরো সরু হয়ে গেছে।

পুরঞ্জন বললে, "এই হচ্ছে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা! এখন অগ্রসর হও সুবন্ধু, আমাদের পিতৃভূমির পবিত্র পথে! জয়, ভারতবর্ষের জয়!"

সুবন্ধু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "ভাগ্যবান বন্ধু! দুদিন পরে বিরাট ভারতবর্ষ দেবে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাদেরই নামে জয়ধ্বনি! এসো একবার শেষ আলিঙ্গন দাও! তারপর আমি চলি ঘুমন্ত ভারতের পথে, আর তোমরা চল জাগন্ত মৃত্যুর পথে!"

পুরঞ্জন সজোরে সুবন্ধুকে বুকের ভিতরে চেপে ধ'রে বললে, "না

বন্ধু, মৃত্যুর পথ এখন ভারতের দিকেই অগ্রসর হয়েছে! আমরাও বাঁচবো না, তোমরাও বাঁচবে না, বিদায়!"

চিত্ররথকে আলিঙ্গন ক'রে সুবন্ধু যখন বেগে ছুটতে লাগল তখন তার দুই চোখ দিয়ে ঝরছে ঝর্ ঝর্ ক'রে অশ্রুর ঝরণা!

চিত্ররথ তার বিরাট দেহ নিয়ে সেই দেড়-হাত-সরু পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য ক'রে বললে, "ভাই পুরঞ্জন, কাঁধ থেকে ধনুক নামাও! দেখছ, নির্বোধ গ্রীকদের কেউ ধনুক-বাণ আনেনি। আমাদের ধনুকের বাণগুলোই আজ ওদের উপরে উঠতে দেবে না।" ব'লেই সে নিজের ধনুক হাতে নিলে।

ওদিকে ত্রিশজন গ্রীক সৈনিক তখন পাহাড়ের তলদেশে এসে হাজির হয়েছে। এখানে ঘোড়া অচল এবং পদব্রজেও উপরে উঠে একসঙ্গে আক্রমণ করা অসম্ভব দেখে তারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে লাগল।

তাদের অধ্যক্ষ তরবারি নেড়ে নীচে থেকে চেঁচিয়ে বললে, "ওরে ভারতের নির্বোধরা! ভালো চাস তো এখনো আত্মসমর্পণ কর, নইলে মৃত্যু তোদের নিশ্চিত!"

পুরঞ্জন ও চিত্ররথ কোনো জবাব দিলে না, কেবল ধনুকে বাণ লাগিয়ে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে রইল।

অধ্যক্ষ চীৎকার ক'রে বললে, "শোনো গ্রীসের বিশ্বজয়ী বীরগণ! সম্রাটের আদেশ, হয় ওদের বন্দী, নয় বধ করতে হবে! প্রাণের ভয়ে ঐ কাপুরুষরা নীচে যখন নামতে রাজি নয়, তখন ওদের আক্রমণ করা ছাড়া উপায় নেই! যাও, তোমরা ওদের বন্দী করো, নয় ইঁদুরের মতো টিপে মেরে ফেলো!"

ঢাল, বর্শা, তরবারি নিয়ে গ্রীকরা পাহাড়ে-পথের উপরে

উঠতে লাগল—কিন্তু একে একে, কারণ পাশাপাশি দুজনের ঠাঁই সেখানে নেই, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুরঞ্জন ও চিত্ররথের ধনুকের ছিলায় জাগল মৃত্যু-বীণার অপূর্ব সঙ্গীত,—সাহসী যোদ্ধাদের চিত্তে চিত্তে নাচায় যা উন্মত্ত আনন্দের বিচিত্র নূপুর!

গ্রীকরা ঢাল তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে, কিন্তু বৃথা! মিনিট-তিনেকের মধ্যেই চারজন গ্রীক সৈনিকের দেহ হত বা আহত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল!

চিত্ররথ তার প্রচণ্ড কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বললে, "আয় রে গ্রীক কুক্কুরের দল! ভারতের দুই জোড়া বাহু আজ তোদের ত্রিশজোড়া বাহুকে অক্ষম ক'রে দেবে!"

পুরঞ্জন ধনুক থেকে বাণ ত্যাগ ক'রে বললে, "তোরা যদি না পারিস, তোদের সর্দার ডাকাত আলেকজাণ্ডারকে ডেকে আন!"

পাঁচ-ছয়বার চেষ্টার পর গ্রীকদের দলের এগারো জন লোক হত বা আহত হ'ল।

পুরঞ্জন সানন্দে বললে, "দু-ঘণ্টা কেটে গেছে! সুবন্ধুকে আর কেউ ধরতে পারবে না। জয়, ভারতবর্ষের জয়।"

গ্রীক সেনাধ্যক্ষ মনে মনে প্রমাদ গুণলে; ও-পথ হচ্ছে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর পথ! ত্রিশজনের মধ্যে এগারোজন অক্ষম হয়েছে, বাকী আছে উনিশজন মাত্র! দুজনের কাছে ত্রিশজনের শক্তি ব্যর্থ, সম্রাট শুনলে কী বলবেন!

হঠাৎ একজন সৈনিক এসে খবর দিলে, "পাহাড়ে ওঠবার আর একটা নতুন পথ পাওয়া গেছে!"

সেনাধ্যক্ষ সানন্দে বললে, "জয় আলেকজাণ্ডারের জয়! আমরা নয়জনে এইখানেই থাকি। বাকী দশজনে নতুন পথ দিয়ে উপরে উঠে শক্রদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াক! তারপরে দুই দিক থেকে ওদের আক্রমণ করো!

বেশ-খানিকক্ষণ কেটে গেল! শক্রদের কেউ আর উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে না দেখে চিত্ররথ আশ্চর্য হয়ে বললে, "পুরঞ্জন, তাহ'লে আমরা কি অনন্ত কালের জন্যে এইখানেই ধনুকে তীর লাগিয়ে ব'সে থাকবো?

পুরঞ্জন, বললে, "হাঁ। যত সময় কাটবে, সুবন্ধু ততই দূরে গিয়ে পড়বে। আমরা তো তাইই চাই!"

পাহাড়ের গায়ে ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে উঠতে লাগল। সূর্য গিয়েছে আকাশের পশ্চিমে।

আচম্বিতে পাহাড়ের উপর জেগে উঠল ঘন ঘন পাদুকার পর পাদুকার শব্দ!

চিত্ররথ মুখ ফিরিয়ে দেখেই কঠোর হাসি হেসে বললে, "পুরঞ্জন, এ-জীবনে শেষবারের মতো ভারতের নাম ক'রে

নাও! জয় ভারতবর্ষের জয়! চেয়ে দেখো, শত্রুরা আমাদের পিছনে!”

—“শত্রুরা আমাদের দুই দিকেই! দেখো চিত্ররথ, নীচে থেকেও ওরা উপরে উঠছে!”

—“পুরঞ্জন, আমার ধনুকের জন্যে আর দু’টি মাত্র বাণ আছে!”

—“চিত্ররথ, আমার ধনুকের জন্যে আর একটিমাত্র বাণও নেই!”

—“তাহ’লে আবার বলো,—জয়, ভারতবর্ষের জয়!”

—“জয়, ভারতবর্ষের জয়! নাও তরবারি, ঝাঁপিয়ে পড়ো মৃত্যুর মুখে!”

পুরঞ্জন ও চিত্ররথের তরবারি নাচতে লাগল অধীর পুলকে, অস্তগামী সূর্যের শেষ-কিরণ আরক্ত ক’রে তুললে তাদের সাংঘাতিক আকাঙ্ক্ষাকে! তিনজন গ্রীক সৈনিকের মৃতদেহ পাহাড়ের কালো দেহকে লালে লাল ক’রে তুললে বটে, কিন্তু তারপর আর আত্মরক্ষা করতে পারলে না ভারতের বীরত্ব! ত্রিশজনের বিরুদ্ধে মাত্র দুইজন দাঁড়িয়ে চৌদ্দ জন শত্রুনাশ করেছে, কিন্তু তারপরেও অবশ্যম্ভাবীকে আর বাধা দেওয়া গেল না! গ্রীক তরবারির মুখে পুরঞ্জনের দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির উপরে গিয়ে পড়ল, কিন্তু তখনো সে কাতর হ’ল না, বাম হাতে বর্শা নিয়ে শত্রুদের দিকে বেগে তেড়ে গেল আহত সিংহের মতো গর্জন ক’রে।

পর-মুহূর্তেই পুরঞ্জনের ছিন্নমুণ্ড দেহ ভূমিতলকে আশ্রয় করলে।

চিত্ররথেরও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরছে তখন রক্তের রাঙা হাসি! প্রায়-বিবশ দেহে পাহাড়ের গা ধ’রে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে সে ব’লে

উঠল, "নমস্কার ভারতবর্ষ! নমস্কার পঞ্চনদের তীর!" তারপরেই আবার এলিয়ে শুয়ে প'ড়ে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

গ্রীক সেনাধ্যক্ষ চমৎকৃত ভাবে দুই মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বললে, "এই যদি ভারতের বীরত্বের নমুনা হয়, তাহ'লে আমাদের অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ বলতে হবে!"

আর একজন সৈনিক বললে, "এরা ছিল তো তিনজন, কিন্তু আর-একটা লোককে দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

সেনাধ্যক্ষ চম্‌কে উঠে বললে, "ঠিক বলেছ, তাই তো! সে পালাতে পারলে এত রক্তারক্তি, হত্যাকাণ্ড সব ব্যর্থ হবে!"

গ্রীকরা ব্যস্ত হয়ে পাহাড়ের আরো উপরে উঠতে লাগল।

কিন্তু সুবন্ধু পাহাড় ছেড়ে নেমে গেছে পাঁচ ঘণ্টা আগে। স্বদেশের পথ থেকে তাকে আর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পুরঞ্জন ও চিত্ররথের আত্মদান বিফল হবে না।

তখনো ভীমার্জুনের বীরত্ব-গাথা প্রাচীন কাব্যের সম্পত্তি হয় নি। ভারতের বীরগণ তখন ভীমার্জুনকে প্রায় সমসাময়িক ব'লে মনে করতেন। ভারতের ঘরে ঘরে, পঞ্চনদের তীরে তাই তখন বিরাজ করত লক্ষ লক্ষ পুরঞ্জন ও চিত্ররথ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়

বিরাট হিন্দুকুশের তুষার-অরণ্য ভেদ ক'রে আপাতত আমরা আর সুবন্ধুর অনুসরণ করবো না। ভারতের ছেলে ভারতে ফিরে আসছে, যথাসময়েই আবার তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবো সাদরে। এখন এই অবকাশে আমরা গল্প-সূত্র ছেড়ে অন্যান্য দু-চারটে দরকারি কথা আলোচনা ক'রে নিই। কি বলো?

স্বদেশকে আমরা সবাই ভালোবাসি নিশ্চয়, কারণ, বনমানুষ ও সাধারণ জানোয়াররা পর্যন্ত স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হ'লে সুখী হয় না। আফ্রিকার গরিলাদের অন্য দেশে ধ'রে নিয়ে গেলে প্রায়ই তারা মারা পড়ে! তাদের যত যত্নই করা হোক, যত ভালো খাবারই দেওয়া হোক, তবু তাদের মনের দুঃখ ঘোচে না। এই দুঃখই হচ্ছে তাদের স্বদেশ-প্রীতি। গরিলাদের স্বদেশ-প্রীতি আছে, আমাদের থাকবে না?

অবশ্য আমাদের—অর্থাৎ মানুষদের—মধ্যে গরিলারও চেয়ে নিম্নশ্রেণীর জীব আছে দু-চারজন। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, তারা বাস করে এই ভারতবর্ষেই। তারা দু-তিন বছর বিলাতী কুয়াশার মধ্যে বাস ক'রে দেশের মাটি, দেশের মায়া, দেশের ভাষা, দেশের সাজ-পোষাক ভুলতে চায় এবং নিজেদের ব্যর্থ নকল সাহেবিয়ানা নিয়ে গর্ব করতে লজ্জিত হয় না। তোমরা যখনি সুযোগ পাবে, এদের মূর্খতার শাস্তি দিতে ভুলো না।

হাঁ, স্বদেশকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু সে ভালোবাসার পরিমাণ হয়তো যথেষ্ট নয়। এই বর্তমান যুগেই দেশের কতটুকু খবর আমরা রাখতে পারি? প্রাচীন ভারতের খবর আমরা প্রায় কিছুই জানি না বললেও হয়। বিদেশী রাজার তত্ত্বাবধানে ইস্কুল-কলেজে যে-সব ইতিহাস আমরা মুখস্থ করি, তার ভিতরে স্বাধীন ভারতের অধিকাংশ গৌরব ও বর্ণ-বৈচিত্র্যকে অন্ধকারের কালো রং মাখিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং নানা ভাবে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয় যে, য়ুরোপীয়রা আসবার আগে ভারতে না ছিল উচ্চতর সভ্যতা, না ছিল প্রকৃত সুশাসন, না ছিল যথার্থ সাম্রাজ্য। কিন্তু তোমরা যদি চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় সম্রাটদের জীবনচরিত পড়ো তাহ'লে বুঝবে যে, সমগ্র পৃথিবীর কোনো সম্রাটই তাঁদের চেয়ে উচ্চতর সম্মানের দাবি করতে পারেন না। তাঁদের যুগে ভারত সভ্যতা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ললিতকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যত উচ্চে উঠেছিল, আজকের অধঃপতিত আমরা তা কল্পনাও করতে পারবো না। এইচ্, জি, ওয়েলস্ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলতে অশোককেই বোঝায়। অশোক ছিলেন আসমুদ্র হিমাচলের অধীশ্বর, কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন করেছেন প্রেমের দ্বারা! রণক্ষেত্রে ভারতের নেপোলিয়ন উপাধি লাভ করেছেন সমুদ্রগুপ্ত, তাঁর দেশ ছিল বাঙলার পাশেই পাটলিপুত্রে। সমগ্র ভারত জয় ক'রেও তিনি তৃপ্ত হন নি, ললিতকলা ও সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সম্রাট হর্ষবর্ধনও কেবল দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি একজন অমর নাট্যকার ও কবি ব'লে পরিচিত ("নাগানন্দ", "রত্নাবলী" ও "প্রিয়দর্শিকা" প্রভৃতি তাঁরই বিখ্যাত রচনা)। তাঁর মতন একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি ও দিগ্বিজয়ী

সম্রাট পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়।

এমন সব সন্তানের পিতৃভূমি যে ভারতবর্ষ, আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ীরূপে সেখানে এসে কেমন ক'রে অম্লান গৌরবে স্বদেশে ফিরে গেলেন? তোমাদের মনে স্বভাবতই এই প্রশ্নের উদয় হ'তে পারে। এর জবাবে বলা যায়ঃ ঐতিহাসিক যুগে বিরাট ভারত-সাম্রাজ্যের একছত্র অধিপতিরূপে সর্বাগ্রে দেখি চন্দ্রগুপ্তকে। তিনি আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক হ'লেও গ্রীকদের ভারত-আক্রমণের সময়ে ছিলেন স্বদেশ থেকে নির্বাসিত, সহায়-সম্পদহীন ব্যক্তি। তাঁর হাতে রাজ্য থাকলে আলেকজাণ্ডার হয়তো বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারতেন না। আলেকজাণ্ডার উত্তর-ভারতের এক অংশ মাত্র অধিকার করেছিলেন, তাও তখন বিভক্ত ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে এবং সে-সব রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ছিল না একতা। তখন আলেকজাণ্ডারের প্রধান শত্রু রাজা পুরুর চেয়েও ঢের বেশী বিখ্যাত ও শক্তিশালী ছিলেন পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনার) নন্দবংশীয় রাজা। তাঁর নিয়মিত বাহিনীতে ছিল আশী হাজার অশ্বারোহী, তুই লক্ষ পদাতিক, আট হাজার যুদ্ধরথ ও ছয় হাজার রণহস্তী। দরকার হ'লে এদের সংখ্যা ঢের বাড়তে পারত, কারণ এর কয়েক বৎসর পরেই দেখি, মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাটলিপুত্রের ফৌজ দাঁড়িয়েছে এইরকমঃ ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশহাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার রণহস্তী এবং অসংখ্য রথ। সুতরাং পাটলিপুত্রের রাজা নন্দের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের শক্তি-পরীক্ষা হ'লে কি হ'ত বলা যায় না! আলেকজাণ্ডার পাটলিপুত্রের দিকে আসবার প্রস্তাবও করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই প্রস্তাব শুনেই সমগ্র গ্রীকবাহিনী বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করেছিল এবং তার প্রধান কারণই এই যে ক্ষুদ্র রাজা পুরুর দেশেই গ্রীকরা ভারতীয়

বীরত্বের যেটুকু তিক্ত আস্বাদ পেয়েছিল, তাদের পক্ষে সেইটুকুই হয়ে উঠেছিল যথেষ্টের বেশী।

তারপর আর এক প্রশ্ন। ভারতবর্ষে আমরা গ্রীক-বীরত্বের যে-ইতিহাস পাই, তা বহু স্থলেই অতিরঞ্জিত, কোথাও কল্পিত এবং কোথাও অমূলক কিনা? আমার বিশ্বাস, হাঁ। কারণ এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক চিত্রকর নিজের ছবিই নিজে এঁকেছেন। এই খবরের কাগজের যুগে, সদা-সজাগ বেতার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের রাজ্যেও নিত্যই দেখছি যুদ্ধে নিযুক্ত দুই পক্ষই প্রাণপণে সত্যগোপন করছে, হেরে বলছে হারিনি, সামান্য জয়কে বলছে অসামান্য! সুতরাং সেই কল্পনাপ্রিয় আদ্যিকালে গ্রীকরা যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতো ইতিহাস লিখেছিল, তা কেমন ক'রে বলি? গ্রীকরা যে কোথাও হারে নি, তাই বা কেমন ক'রে মানি? আধুনিক য়ুরোপীয় লেখকরাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের কোনো কোনো অতিরঞ্জিত ও অসত্য কথা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় হচ্ছে, ভারতের বুকের উপর দিয়ে এত-বড় একটা ঝড় ব'য়ে গেল, তবু হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে তার এতটুকু ইঙ্গিত বা উল্লেখ দেখা যায় না! এও অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক।

এবং গ্রীকরা যে অকারণে ভয় পায় নি, তার কিছুদিন পরেই সে-প্রমাণ পাওয়া যায়। সে এখন নয়, যথাসময়ে বলবো।

গ্রীকদের সঙ্গে ভারতবাসীদের প্রথম মৃত্যু-মিলন হয় যে-নাট্যশালায়, এখন সেই অঞ্চলের তখনকার অবস্থার সঙ্গে তোমাদের পরিচিত করতে চাই। গল্প-বলা বন্ধ রেখে বাজে কথা বলছি ব'লে তোমাদের অনেকেই হয়তো রাগ করবে। কিন্তু আমাদের দেশের পুরাণো ইতিহাসের সঙ্গে লোকের পরিচয় এত অল্প যে, স্থান-কাল সম্বন্ধে একটু ভূমিকা না দিলে এই ঐতিহাসিক কাহিনীর আসল রসটুকু কিছুতেই জমবে না।

সীমান্তের যে প্রদেশগুলি উত্তর-ভারতবর্ষের সিংহদ্বারের মতো এবং সর্বপ্রথমেই যাদের মধ্য দিয়ে আসবার সময়ে গ্রীকদের তরবারি ব্যবহার করতে হয়েছিল প্রাণপণে, সে-যুগে তাদের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল।

ভারতের উত্তর-সীমান্তের দেশগুলিতে আজকাল প্রধানত মুসলমানদের বাস। কিন্তু মহম্মদের জন্মের বহু শত বৎসর আগেই আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ভারতবর্ষে। সুতরাং পৃথিবীতে তখন একজনও মুসলমান ছিলেন না (একজন ক্রীশ্চানও ছিলেন না, কারণ যীশুখৃষ্ট জন্মাবার তিনশো সাতাশ বৎসর আগে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেছিলেন)।

ভারতে প্রচলিত তখন প্রধানত বৈদিক হিন্দু-ধর্ম। য়ুরোপীয় গ্রীকরা ছিলেন পৌত্তলিক। কিন্তু আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, হিন্দুরা খুব-সম্ভব তখন প্রতিমা ও মন্দির গ'ড়ে পূজা করতেন না, অথবা করলেও তার বেশী চলন হয় নি। অনেক ঐতিহাসিকের মত হচ্ছে, এদেশে মন্দির ও প্রতিমার চলন হয় গ্রীকদের দেখাদেখি। ভারতে তখন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেরও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধেরও কোনো মূর্তি গড়া হয় নি। প্রথম বুদ্ধ-মূর্তিরও জন্ম গ্রীক প্রভাবের ফলে।

সীমান্তের দেশগুলিতে বাস করত তখন কেবল ভারতের লোক নয়, বাইরেকার নানান জাতি। একদিক থেকে আসত চীনের বাসিন্দারা আর একদিক থেকে আসত মধ্য-এসিয়ার শক ও হুন প্রভৃতি যাযাবর জাতিরা এবং আর এক দিক থেকে আসত পার্সী ও গ্রীক প্রভৃতি আর্যরা। এমনি নানা ধর্মের নানা জাতির লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করার ফলে সীমান্তবাসী বহু ভারতীয়ের মনের ভাব হয়ে উঠেছিল অনেকটা সার্বজনীন। এ-অবস্থায় দেশাত্মবোধের ও হিন্দুত্বের

ভাবও অনেকটা কম-জোরি হ'য়ে পড়াই স্বাভাবিক। হয়তো সেই কারণেই সীমান্ত-প্রদেশে আজ হিন্দুর সংখ্যা এত অল্প।

তোমরা শুনলে অবাক হবে, সে-যুগেও ভারতে বিশ্বাসঘাতকের অভাব হয় নি। এ লোকটি আগে ছিল পার্সীদের মাহিনা-করা সৈনিক, পরে হয় আলেকজাণ্ডারের বিশ্বস্ত এক হিন্দু সেনাপতি। এর নাম শশীগুপ্ত, গ্রীকরা ডাকত সিসিকোটস্ ব'লে। গ্রীকদের সঙ্গে সেও ভারতের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে এবং সেও ছিল উত্তর-ভারতের বাসিন্দা। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আগমনের পরে সীমান্তের আরো বহু বিশ্বাসঘাতক হিন্দু গ্রীক-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল বা দিতে বাধ্য হয়েছিল।

সে-যুগে সীমান্তের একটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল তক্ষশীলা। বর্তমান রাওলপিণ্ডি সহর থেকে বিশ-বাইশ মাইল দূরে আজও প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ দেখে অভিভূত হ'লেও তক্ষশীলার অতীত গৌরবের কাহিনী আমরা কিছুই অনুমান করতে পারবো না। কারণ প্রাচীন প্রাচ্য জগতে তক্ষশীলা ছিল অন্যতম প্রধান নগর। জাতকের মতে, তক্ষশীলা হচ্ছে গান্ধার রাজ্যের অন্তর্গত সহর, "মহাভারতে"র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ও দুর্যোধনের মাতা গান্ধারী এই দেশেরই মেয়ে। বর্তমান পেশোয়ারও ঐ গান্ধারেরই আর একটি স্থান, কিন্তু তখন তার নাম ছিল "পুরুষপুর"। ওখানকার লোকদের দেহ ছিল যে সত্যিকার পুরুষেরই মতো, আজও পেশোয়ারীদের দেখলে সেটা অনুমান করা যায়।

তক্ষশীলা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যও অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শিক্ষা-কেন্দ্র বারাণসীও নানা বিদ্যার জন্যে তক্ষশীলার কাছে ঋণী। বিশেষ ক'রে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখবার জন্যে তক্ষশীলায় তখন সারা ভারতের ছাত্রদের গমন করতে

হ'ত। পাটনা বা পাটলিপুত্রের রাজা বিম্বিসারের সভা-চিকিৎসক জীবককে শিক্ষালাভের জন্যে তক্ষশীলায় সাত বৎসর বাস করতে হয়েছিল। পরে সম্রাট কণিষ্কের যুগে তক্ষশীলার আরো উন্নতি হয়, কারণ পুরুষপুরেই ছিল কণিষ্কের রাজধানী। প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি, শক-বংশীয় বৌদ্ধ ভারত-সম্রাট কণিষ্ক পুরুষপুরে একটি অপূর্ব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, প্রাচীন জগতে যা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য ব'লে গণ্য হ'ত। মন্দিরটি কাঠের। তেরো তালা। এবং উচ্চতায় চারিশত ফুট—অর্থাৎ কলকাতার মনুমেণ্টের চেয়ে কিছু-কম তিনগুণ বেশী লম্বা। দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত সে মন্দির এখন আর নেই, গজ্‌নীর মুসলমান দিগ্বিজয়ী মামুদ তাকে ধ্বংস করেছিলেন।

তক্ষশীলার কাছেই ছিল রাজা হস্তীর রাজ্য। পরের পরিচ্ছেদে গল্প সুরু হ'লেই তোমরা এঁর কথা শুনবে!

আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে পদার্পণ করেন, সেই সময়ে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে তক্ষশীলার যুদ্ধ চলছিল। তার একটি হচ্ছে ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য, নাম "অভিসার" (আজও এর সঠিক অবস্থানের কথা আবিষ্কৃত হয় নি)। আর একটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য, ইতিহাস-বিখ্যাত পুরু ছিলেন তার রাজা। ঝিলাম ও চিনাব নদের মধ্যবর্তী স্থলে ছিল পুরুর রাজ্য বিস্তৃত এবং তার নগরের সংখ্যা ছিল তিন শত। সুতরাং বোঝা যায় পুরু বড় তুচ্ছ রাজা ছিলেন না। তাঁর সৈন্যসংখ্যাও ছিল পঞ্চাশ হাজার।

কিন্তু সীমান্তে এখনকার মতন তখনও পার্বত্য খণ্ডরাজ্য ছিল অনেক। গ্রীকদের বিবরণীতে বহু দেশের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা ভারতীয় নাম আয়ত্তে আনতে পারতেন না ব'লে বিকৃত ক'রে লিখতেন। এই দেখোনা, চন্দ্রগুপ্তকে তাঁরা বলতেন, স্যাণ্ড্রাকোটস্! কাজেই গ্রীকদের পুঁথিপত্রে সীমান্তের অধিকাংশ দেশের নাম প'ড়ে আজ আর কিছু ধরবার উপায় নেই, বিশেষ একে-তো সেই-সব খণ্ড-

রাজ্যের অনেকগুলিই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে, তার উপরে বাকি যাদের অস্তিত্ব আছে, মুসলমান ধর্ম অবলম্বন ক'রে তারাও আপনাদের নূতন নূতন নাম রেখেছে—যেমন 'পুরুষপুর' হয়েছে 'পেশোয়ার'। কোনো কোনো গ্রীক নামের সঙ্গে আবার আসল নামের কিছুই সম্পর্ক নেই। যেমন ঝিলাম নদ গ্রীকদের পাল্লায় প'ড়ে হয়েছে Hydaspes এবং চিনাব নদ হয়েছে Akesines !

যাক, নাম নিয়ে বড় আসে-যায় না। কারণ নাম বা রাজ্য লুপ্ত হোক, সীমান্তের দেশগুলি আগেও যেমন ছিল এখনো আছে অবিকল তেমনি। উপরন্তু সেখানকার জড় পাহাড় ও পাথরের মতনই জ্যান্তো মানুষগুলিরও ধাত একটুও বদলায় নি! আজও তাদের কাছে জীবনের সব-চেয়ে বড় আমোদ হচ্ছে মারামারি, খুনোখুনি, যুদ্ধবিগ্রহ! যখন বাইরের শত্রু পাওয়া যায় না, তখন তারা নিজেদের মধ্যেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। প্রথম বয়সে আমি ও-অঞ্চলে বৎসর-খানেক বাস করেছিলুম। সেই সময়েই প্রমাণ পেয়েছিলুম, মানুষের প্রাণকে তারা নদীর জলের চেয়ে মূল্যবান ব'লে ভাবে না। বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রিটিশ-রাজ পর্যন্ত তাদের অত্যাচারে সর্বদাই তটস্থ, সর্বদাই বাপু-বাছা ব'লে ও মোটা টাকা ভাতা দিয়ে তাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টায় থাকেন। কারণ উড়োজাহাজের বোমা, মেসিন-গানের গোলা ও ব্রিটিশ-সিংহের গর্জন এদের কোনোটিই তাদের যুদ্ধ-উন্মাদনাকে শান্ত করতে পারে না। মরণ-খেলা তারা খেলবেই এবং মরতে মরতে মারবেই।

আলেকজাণ্ডারের যুগে তারা মুসলমান ছিল না, হয়তো আর্য ও সভ্যও ছিল না, কিন্তু হিন্দুই ছিল ব'লে মনে করি। এবং তাদের শৌর্য-বীর্য ছিল এখনকার মতোই ভয়ানক! ভারতের বিপুল সিংহদ্বারের সামনে এই নির্ভীক, যুদ্ধপ্রিয় দৌবারিকদের দেখে গ্রীক দিগ্বিজয়ীকে যথেষ্ট দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছিল। এদের পিছনে

রেখে ভারতবর্ষের বুকের ভিতরে প্রবেশ করা আর আত্মহত্যা করা যে একই কথা, সেটা বুঝতে তাঁর মতো নিপুণ সেনাপতির বিলম্ব হয় নি। তাই ভারত-বিজয়ের স্বপ্ন ভুলে বিরাট বাহিনী নিয়ে সর্বাগ্রে তাঁকে এদেরই আক্রমণ করতে হয়েছিল এবং তখনকার মতো এদের ঢিট্ করবার জন্যে তাঁর কেটে গিয়েছিল বহুকাল।

যে রঙ্গমঞ্চের উপরে অতঃপর আমাদের মহানাটকের অভিনয় আরম্ভ হবে, তার পৃষ্ঠপটের একটি রেখাচিত্র এখানে এঁকে রাখলুম। এটি তোমরা স্মরণ ক'রে রেখো। শত শত যুগ ধ'রে এই পৃষ্ঠপটের সুমুখ দিয়ে এসেছে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখে, দেশ-লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অথবা সোনার ভারতে স্থায়ী ঘর বাঁধবে ব'লে পঙ্গপালের মতো লক্ষ লক্ষ বিদেশী। তাদের দৌরাত্ম্যে আজ সোনার ভারতের নামমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এখানে আর সোনা পাওয়া যায় না।

তোমরা গল্প শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ ?

মনে আছে, ভারত-পুত্র সুবন্ধু ফিরে আসছে আবার তার পিতৃভূমিতে,—দুই চক্ষে তার উন্মত্ত উত্তেজনা, দুই চরণে তার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড গতি ?

তারপর সুবন্ধু কিনেছে একটি ঘোড়া, কিন্তু পথশ্রমে ও দ্রুতগতির জন্যে সে মারা পড়ল। দ্বিতীয় ঘোড়া কিনলে, তারও সেই দশা হ'ল। কিন্তু তার তৃতীয় অশ্ব মাটির উপর দিয়ে যেন উড়ে আসছে পক্ষীরাজের মতো !

বহুযুগের ওপার থেকে তার ঘোড়ার পদশব্দ তোমরা শুনতে পাচ্ছ ?

সুবন্ধু এসে হাজির হয়েছে ভারতের দ্বারে। কিন্তু তখনও কারুর ঘুম ভাঙে নি।......জাগো ভারত ! জাগো পঞ্চনদের তীর !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজার ঘোড়া

তক্ষশীলার অদূরে মহারাজা হস্তীর রাজ্য। মহারাজা হস্তীর নাম গ্রীকদের ইতিহাসে সসম্মানে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তাঁর রাজধানীর নাম অতীতের গর্ভে হয়েছে বিলুপ্ত।

তবু তাঁর রাজধানীকে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কাছে, দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় এবং গিরিনদীদের বুকে বুকে নাচছে গাছের শ্যামল ছায়া, আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা। এক-একটি পাহাড়ের শিখরের উপরেও আকাশ-ছোঁয়া মাথা তুলে আছে সুরক্ষিত গিরিদুর্গ—তাদের চক্ষুহীন নির্বাক পাথরে পাথরে জাগছে যেন ভয়ানকের ভ্রূভঙ্গ!

রাজধানীর বাড়ী-ঘর কাঠের। সেকালে ভারতবাসীরা পাথর বা ইট ব্যবহার করত বড়-জোর বনিয়াদ গড়বার জন্যে। অনেক কাঠের বাড়ী তিন-চার-পাঁচ তালা কি আরো-বেশী উঁচু হত। কাঠের দেওয়ালে দরজায় থাকত চোখ-জুড়ানো কারুকার্য। কিন্তু সে-সব কারুকার্য বর্তমানের বা ভবিষ্যতের চোখ আর দেখবে না, কারণ কাঠের পরমায়ু বেশী নয়। তবে পরে ভারত যখন পাথরের ঘর-বাড়ী তৈরি করতে লাগল, তখনকার শিল্পীরা আগেকার কাঠে-খোদাই কারুকার্যকেই সামনে রাখলে আদর্শের মতো। ঐ-সব পুরাণো মন্দিরের কতকগুলি আজও বর্তমান আছে। তাদের দেখে তোমরা খৃষ্ট-পূর্ব যুগের ভারতীয় কাঠের বাড়ীর সৌন্দর্য কতকটা অনুমান করতে পারবে। ভারতের প্রতিবেশী ব্রহ্ম ও চীন

প্রভৃতি দেশ কাঠের ঘর-বাড়ী-মন্দির গ'ড়ে আজও প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার সেই চিরাচরিত রীতির সম্মান রক্ষা করে।

খৃষ্ট জন্মাবার আগে তিনশো-সাতাশ অব্দের জুন মাসের একটি সুন্দর প্রভাত। শীত-কুয়াশার মৃত্যু হয়েছে। চারিদিক শান্ত সূর্যকরে সমুজ্জ্বল। সহরের পথে পথে নাগরিকদের জনতা। তখন পৃথিবীর কোথাও কেউ পর্দা-প্রথার নাম শোনেনি, তাই জনতার মধ্যে নারীর সংখ্যাও অল্প নয়। নারী ও পুরুষ উভয়েরই দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ গৌর, পরোনে জামা, উত্তরীয়, পা-জামা। দুর্বল ও খর্ব চেহারা চোখে পড়েনা বললেই হয়।

চারিদিকে নবজাগ্রত জীবনের লক্ষণ। দোকানে বাজারে পসারী ও ক্রেতাদের কোলাহল, জনতার আনাগোনা, নদীর ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়, দলে দলে মেয়ে জল তুলে কলসী মাথায় নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসছে, পথ দিয়ে রাজভৃত্য দামামা বাজিয়ে নূতন রাজাদেশ প্রচার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, স্থানে স্থানে এক-এক দল লোক দাঁড়িয়ে তাই নিয়ে আলোচনা করছে এবং অনেক বাড়ীর ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে বৈদিক মন্ত্রপাঠের গম্ভীর ধ্বনি।

নগর-তোরণে দুজন প্রহরী অভিসার ও তক্ষশীলা রাজ্যের নূতন যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে গল্প করছে এবং অনেকগুলি নাগরিক তাই শোনবার জন্যে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রহরী বলছে; "তক্ষশীলার বুড়ো রাজার ভীমরতি হয়েছে।"

দ্বিতীয় প্রহরী বললে, "কেন ?"

—"এই সেদিন মহারাজ পুরুর কাছে তক্ষশীলার সৈন্যরা কী মার খেয়ে পালিয়ে এল, কিন্তু বুড়ো রাজার লজ্জা নেই, আবার এরি মধ্যে অভিসারের রাজার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে, সেদিন নাকি একটা মস্ত লড়াইও হয়ে গেছে।"

—"লড়ায়ে কি হ'ল ?"

—"পাকা খবর এখনো পাই নি। কিন্তু যুদ্ধে যে-পক্ষই জিতুক, দুই রাজ্যেরই হাজার হাজার লোক মরবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠবে, জিনিষ-পত্তরের দাম চড়বে।"

একজন মুরুব্বি-গোছের নাগরিক বললে, "রাজাদের হবে খেয়াল, মরবে কিন্তু প্রজারা !"

প্রহরী বললে, "কিন্তু সব রাজা সমান নয়, মহারাজা হস্তীর রাজত্বে আমরা পরম সুখে আছি ! আমাদের মহারাজা মস্ত যোদ্ধা, কিন্তু তিনি কখনো অন্যায় যুদ্ধ করেন না !"

নাগরিক সায় দিয়ে বললে, "সত্য কথা। মহারাজা হস্তী অমর হোন !"

ঠিক সেই সময় দেখা গেল, মূর্তিমান ঝড়ের মতো চারিদিকে ধূলো উড়িয়ে ছুটে আসছে এক মহাবেগবান ঘোড়া এবং তার পিঠে ব'সে আছে যে সওয়ার, ডানহাতে জ্বলন্ত তরবারি তুলে শূন্যে আন্দোলন করতে করতে চীৎকার করছে সে তীব্র স্বরে।

নগর-তোরণে সমবেত জনতার মধ্যে নানা কণ্ঠে বিস্ময়ের প্রশ্ন জাগল :

—"কে ও ? কে ও ?"

—"ও তো দেখছি ভারতবাসী ! কিন্তু অত চেঁচিয়ে ও কী বলছে ?"

—"পাগলের মতো লোকটা তরোয়াল ঘোরাচ্ছে কেন ?"

অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ল—তার চীৎকারের অর্থও স্পষ্ট হ'ল। সে বলছে—"জাগো ! জাগো ! শত্রু শিয়রে ! অস্ত্র ধরো, অস্ত্র ধরো !"

একজন প্রহরী সবিস্ময়ে বললে, "কে শত্রু ? তক্ষশীলার বুড়ো রাজা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে নাকি ?"

নগর-তোরণে এসেই অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল, "আমাকে মহারাজা হস্তীর কাছে নিয়ে চলো!"

প্রহরী মাথা নেড়ে বললে, "সে হয় না। আগে বলো কে তুমি, কোথা থেকে আসছ?"

গম্ভীর স্বরে সুবন্ধু বললে, "আমি ভারতসন্তান সুবন্ধু। আসছি হিন্দুকুশ ভেদ ক'রে শত শত গিরি নদী অরণ্য পার হয়ে!"

—"কী প্রয়োজনে?"

সুবন্ধুর বিরক্ত দুই চোখে জাগল অগ্নি! অধীর স্বরে বললে, "প্রয়োজন? ওরে ঘুমন্ত, ওরে অজ্ঞান, যবন আলেকজাণ্ডার মহাবন্যার মতো ধেয়ে আসছে হিন্দুস্থানের দিকে, তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য রক্তগঙ্গার তরঙ্গে ভাসিয়ে দেবে আর্যাবর্তকে, এখন কি তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় আছে? নিয়ে চলো আমাকে মহারাজের কাছে! শত্রু ভারতের দ্বারে উপস্থিত, প্রত্যেক মুহূর্ত এখন মূল্যবান।"

....

....

মন্ত্রণাগার! রাজা হস্তী সিংহাসনে। অপূর্ব তাঁর দেহ—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথার্থ পুরুষোচিত। ধব্‌ধবে গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ নাসিকা, দৃঢ়-সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর, কবাট বক্ষ, সিংহ-কটি, আজানু-লম্বিত বাহু। তাঁকে দেখলেই মহাভারতে বর্ণিত মহাবীরদের মূর্তি মনে পড়ে।

রাজার ডানপাশে মন্ত্রী, বাঁ-পাশে সেনাপতি, সামনে কক্ষতলে হাত-জোড় ক'রে জানু পেতে উপবিষ্ট সুবন্ধু—সর্বাঙ্গ তার পথধূলায় ধূসরিত।

রাজার কপালে চিন্তার রেখা, যুগ্ম-ভুরু সঙ্কুচিত। সুবন্ধুর বার্তা তিনি শুনে অনেকক্ষণ মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে রইলেন। তারপর ধীর-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোন্ পথ দিয়ে ভারতে এসেছ?"

—"খাইবার গিরিসঙ্কট দিয়ে।"

—"যবন সৈন্য কোন্ পথ দিয়ে আসছে?"

—"কাবুল নদের পার্শ্ববর্তী উপত্যকা দিয়ে। কিন্তু তারা এখন আর আসছে না মহারাজ, এতক্ষণে এসে পড়েছে।"

—"তুমি আর কি কি সংবাদ সংগ্রহ করেছ, বিস্তৃত ভাবে বলো!"

সুবন্ধু বলতে লাগল, "মহারাজ, নিবেদন করি! আলেকজাণ্ডার তাঁর দুজন বড় বড় সেনাপতিকে সিন্ধুনদের দিকে যাত্রা করবার হুকুম দিয়েছেন। তাঁদের নাম হেফাইস্‌সান্ আর পার্ডিক্কাস্! এই খবর নিয়ে প্রথমে আমি তক্ষশীলার মহারাজার কাছে যাই। কিন্তু বলতেও লজ্জা করে, তক্ষশীলার মহারাজার মুখ এই দুঃসংবাদ শুনে প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'যবন আলেকজাণ্ডার আমার শত্রু নন, আমি আজকেই বন্ধু রূপে তাঁর কাছে দূত পাঠাবো। তিনি এসে স্বদেশী শত্রুদের কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করবেন।' আমি বললুম, 'সে কি মহারাজ, আলেকজাণ্ডার যে ভারতের শত্রু!' তিনি অম্লানবদনে বললেন, 'ভারতে নিত্য শত শত বিদেশী আসছে, আলেকজাণ্ডারও আসুন, ক্ষতি কি? যে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে, তিনি হবেন কেবল তারই শত্রু। তবে তাঁকে দেশের শত্রু বলবো কেন? আর ভারতের কথা বলছ? ভারত কি আমার একলার? বিশাল ভারতে আছে হাজার হাজার রাজা, সুযোগ পেলেই তারা আমার রাজ্য লুট করতে আসবে, তাদের জন্যে আমি একলা প্রাণ দিতে

যাবো কেন? যাও সুবন্ধু, এখনি তক্ষশীলা ছেড়ে চ'লে যাও, নইলে আমায় বন্ধু, সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শত্রু ব'লে তোমাকে বন্দী করবো।' আমি আর কিছু না ব'লে একেবারে আপনার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। এখন আপনার অভিমত কি মহারাজ?"

হস্তী একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, "আমার অভিমত? যথাসময়ে শুনতে পাবে।......মন্ত্রী-মহাশয়, আলেকজাণ্ডার যে পারস্য জয় ক'রে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছিলুম। কিন্তু তাঁর সেনাপতিরা যে এত শীঘ্র ভারতে প্রবেশ করেছেন, এ খবর আপনি রাখেন নি কেন? আমার রাজ্যে কি গুপ্তচর নেই?"

মন্ত্রী লজ্জিত স্বরে বললেন, "মহারাজ, একচক্ষু হরিণের মতো আমাদের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ছিল কেবল খাইবার গিরিসঙ্কটের দিকেই, কারণ বহিঃশত্রুরা ঐ পথেই ভারতে প্রবেশ করে। যবন সৈন্যরা যে নতুন পথ দিয়ে ভারতে আসবে, এটা আমরা কল্পনা করতে পারি নি!"

হস্তী বিরক্তস্বরে বললেন, "এ অন্যমনস্কতা অমার্জনীয়। আচ্ছা সুবন্ধু, তুমি বললে আলেকজাণ্ডার তাঁর দুই সেনাপতিকে এদিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে এখন কোথায়?"

—"মহারাজ, আলেকজাণ্ডার নিজে তাঁর প্রধান বাহিনী নিয়ে সীমান্তের পার্বত্য রাজাদের দমন করতে গিয়েছেন।"

—"হুঁ! দেখছি এই যবন-সম্রাট রণনীতিতে অত্যন্ত দক্ষ। এরি মধ্যে সীমান্তের পার্বত্য রাজাদের মতি-গতি তিনি বুঝে নিয়েছেন! এই যুদ্ধপ্রিয় বীরদের পিছনে রেখে ভারতে ঢুকলে যে সর্বনাশের সম্ভাবনা এ সত্য তিনি জানেন।"

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "সুবন্ধু, যবন-সম্রাটের অধীনে কত সৈন্য আছে?"

—"কেউ বলছে এক লক্ষ, কেউ বলছে লক্ষাধিক। আমার

মতে, অন্তত দেড় লক্ষ। কারণ পথে আসতে আসতে আলেক-জাণ্ডার অসংখ্য পেশাদার সৈন্য সংগ্রহ করেছেন।"

হস্তী বললেন, "কিন্তু বিদেশী যবনরা ভারতে ঢুকবার নতুন পথের সন্ধান জানলে কেমন করে?"

সুবন্ধু তিক্তস্বরে বললে, "ভারতের এক কুসন্তান পিতৃভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রে যবনদের পথ দেখিয়ে আনছে। নাম তার শশীগুপ্ত, সে নাকি আলেকজাণ্ডারের বিশ্বস্ত এক সেনাপতি। মহারাজ, এই শশীগুপ্তের সঙ্গে রণস্থলে একবার মুখোমুখি দেখা করবো, এই হ'ল আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা! আর্যাবর্তের শত্রু আর্য! এ-কথা কল্পনাতীত!" বলতে বলতে তার বলিষ্ঠ ও বৃহৎ দেহ রুদ্ধ ক্রোধে যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

হস্তী একটু হেসে বললেন, "শান্ত হও সুবন্ধু, শশীগুপ্ত এখন তোমার সামনে নেই।......মন্ত্রীমহাশয়, এখন আমাদের কর্তব্য কি? শিয়রে শত্রু, এখনো আমরা ঘুমাবো, না জাগবো? হাত জোড় করবো, না তরবারি ধরবো? গলবস্ত্র হবো, না বর্ম পরবো? আপনি কি বলেন?"

বৃদ্ধ মন্ত্রী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "দেড় লক্ষ যবন-সৈন্যের সামনে আমাদের পঁচিশ-ত্রিশ হাজার সৈন্য কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে মহারাজ? ঝড়ের মুখে একখণ্ড তুলোর মতো উড়ে যাবে!"

সুবন্ধু বললে, "মন্ত্রী-মহাশয়, বৃশ্চিক হচ্ছে ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু বৃহৎ মানুষও তাকে ভয় করে। ক্ষুদ্র হ'লেই কেউ তুচ্ছ হয় না।"

মন্ত্রী হেসে বললেন, "যুবক তোমার উপমা ঠিক হ'ল না। মানুষ বৃশ্চিককে ভয় করলেও এক চপেটাঘাতে তাকে হত্যা করতে পারে।"

সুবন্ধু বললে, "মানলুম। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মূল বাহিনী এখানে আসতে এখনো অনেক দেরী আছে। তাঁর দুই সেনাপতির অধীনে বোধ হয় পঞ্চাশ হাজারের বেশী সৈন্য নেই।"

—"যুবক, তুমি কেবল বর্তমানকে দেখছ, ভবিষ্যৎ তোমার দৃষ্টির বাইরে! আজ আমরা অস্ত্র ধরবো, কিন্তু কাল যখন যবন-সম্রাট নিজে আসবেন সসৈন্যে, তখন আমরা কি করবো?"

সুবন্ধু বললে, "আপনার মতন বিজ্ঞতা আমার নেই বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে আমি ভুলিনি মন্ত্রী-মহাশয়! ভারতে আসবার পথের উপরেই আছে আপনাদের গিরিদুর্গ। সেই গিরি-দুর্গে গিয়ে আপনারা যবন-সেনাপতিদের পথরোধ করুন। যদি দু-মাস দুর্গ রক্ষা করতে পারেন, যবন-সম্রাট স্বয়ং এলেও আপনাদের ভয় নেই।"

—"কেন?"

—"ইতিমধ্যে আমি আমার দেশে—মহারাজা পুরুর রাজ্যে ফিরে যাবো। আমাদের মহাবীর মহারাজাকে কে না জানে? তাঁর কাছ থেকে তক্ষশীলার কাপুরুষতা দুঃস্বপ্নেও কেউ প্রত্যাশা করে না। তাঁর জীবনের সাধনাই হচ্ছে বীরধর্ম। যবনরা আর্যাবর্তে ঢুকতে উদ্যত শুনলেই তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মতো গর্জন ক'রে এখানে ছুটে আসবেন! তার উপরে অভিসার রাজ্যের শত্রু তক্ষশীলা যখন যবনদের পক্ষ অবলম্বন করবে, অভিসারের রাজা তখন নিশ্চয়ই থাকবেন আপনাদের পক্ষে।"

মন্ত্রী জবাব দিলেন না, হতাশভাবে ক্রমাগত মাথা নাড়তে লাগলেন।

হস্তী আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সুবন্ধু, আমাকে ভাবতে সময় দাও—কারণ এ হচ্ছে জীবন-মরণের প্রশ্ন! যবনরা প্রবল, আমরা দুর্বল। তুমি তিন দিন বিশ্রাম করো, আমি ইতিমধ্যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করি!"

কিন্তু তিন দিন পরে সুবন্ধুর কাছে মহারাজা হস্তীকে মতামত প্রকাশ করতে হ'ল না।

চতুর্থ দিনের প্রভাতে মহারাজা যখন রাজকার্যে ব্যস্ত, রাজসভার মধ্যে হ'ল গ্রীকদের এক ভারতীয় দূতের আবির্ভাব।

মহারাজা হস্তী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে মুখ তুললেন। প্রশস্ত ললাট চিহ্নিত হ'ল চিন্তার রেখায়। কিন্তু সঙ্কুচিত ধনুকের মতো যুগ্ম-ভুরুর তলায় চক্ষে যেন জাগল তীক্ষ্ণ অগ্নিবাণ—মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই মৃদুহাস্য ক'রে বললেন, "কি সংবাদ, দূত ?"

—"সমগ্র গ্রীস ও পারস্যের সম্রাট আলেকজাণ্ডার এসেছেন অতিথিরূপে ভারতবর্ষে। আপনি কি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত আছেন ?"

—"দূত, তুমি হিন্দু। তুমি তো জানো, অতিথিকে অভ্যর্থনা করা হিন্দুর ধর্ম।"

—"এ কথা শুনলে সম্রাট আলেকজাণ্ডার আনন্দিত হবেন। তাহলে মিত্ররূপে আপনি তাঁকে সাহায্য করবেন ?"

..."কি সাহায্য, বলো !"

—"সম্রাট আলেকজাণ্ডার বেরিয়েছেন দিগ্বিজয়ে। সৈন্য আর অর্থ দিয়ে আপনাকে তাঁর বন্ধুত্ব ক্রয় করতে হবে।"

—"সম্রাট আলেকজাণ্ডার আমাদের স্বদেশে এসেছেন দিগ্বিজয়ে। ভারতের বিরুদ্ধে আমার ভারতীয় সৈন্যরা অস্ত্রধারণ করবে, এই কি তাঁর ইচ্ছা ?"

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! সম্রাটের আর একটি ইচ্ছা এই যে, সুবন্ধু নামে গ্রীকদের এক শত্রু আপনার রাজ্যে আশ্রয় পেয়েছে। তাকে অবিলম্বে বন্দী ক'রে আমার হাতে অর্পণ করতে হবে।"

মহারাজা হস্তী ফিরে সুবন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যুবক, এই দূতের সঙ্গে তুমি কি গ্রীক-শিবিরে বেড়াতে যেতে চাও ?"

সুবন্ধু অভিবাদন ক'রে বললে, "আপনি আদেশ দিলে শিরোধার্য করবো। কিন্তু দূতকে বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে আমার মৃতদেহ।"

—"দূত, তুমি কি সুবন্ধুর মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারবে? দেখছ, সুবন্ধুর দেহ ক্ষুদ্র নয়, আমারই মতো বৃহৎ? আমার মতে, পতঙ্গের উচিত নয় যে মাতঙ্গকে বহন করতে যাওয়া। পারবে না, কেবল হাস্যাস্পদ হবে।"

—"আপনার একথা থেকে কি বুঝবো? আপনি সম্রাট আলেকজাণ্ডারকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত নন?"

দূতের কথার জবাব না দিয়ে মহারাজা হস্তী বাঁ-পাশে ফিরে তাকালেন। সেনাপতি নিজের কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করছেন। হাসতে হাসতে মহারাজা বললেন, "কি দেখছ সেনাপতি? অনেক দিন যুদ্ধ করনি, তোমার তরবারিতে কি ম'র্চে প'ড়ে গেছে?"

—"না মহারাজ, ম'র্চে-পড়া অসুখ আমার তরবারির কোনদিন হয় নি।"

—"তবে?"

—"তরবারি নাড়লে-চাড়লে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। তাই আমি তরবারি নাড়াচাড়া করছিলুম।"

—"বেশ করছিলে। অনেকদিন আমি তরবারির গান শুনিনি। শোনাতে পারবে?"

—"আদেশ দিন মহারাজ!

হস্তী আচম্বিতে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখের নিমিষে নিজের খাপ্ থেকে তরোয়াল খুলে শূন্যে তুলে জলদ-গম্ভীর স্বরে বললেন, "শোনাও তবে মুক্ত তরবারির রক্ত-রাগিণী—নাচাও তবে জীবনের বুকে মৃত্যুর ছন্দ! প্রাচীন আর্যাবর্তে

এ রাগিণীর ছন্দ নূতন নয়—ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কত বীর কতবার ধনুকের টঙ্কারে অসির ঝঙ্কারে এই অপূর্ব সঙ্গীতের সাধনা ক'রে গেছেন, ভারত যে যুগযুগান্তরেও তাঁদের সাধনা ভুলবে না—"

বৃদ্ধ মন্ত্রী বাধা দিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "মহারাজ—মহারাজ—"

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে হস্তী বললেন, "থামুন মন্ত্রী-মহাশয়! তরবারি যেখানে গান গায় বৃদ্ধের স্থান সেখানে নয়! সেনাপতি, ডাক দাও তোমার দেশের ঘরে ঘরে দুরন্ত বেপরোয়া বাঁধনখোলা যৌবনকে, গগনভেদী অট্টহাসির মধ্যে লুপ্ত হ'য়ে যাক্ হিসেবী বিজ্ঞতার বাণী!"

দূত বললে "মহারাজ, উত্তর!"

হস্তীর চক্ষে আবার জাগ্রত অগ্নি। বজ্রকণ্ঠে তিনি বললেন, "উত্তর চাও, দূত? কাকে উত্তর দেবো? যবন-সম্রাট অতিথি হ'লে আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর মুখেই দিতুম, কিন্তু তিনি এসেছেন দস্যুর মতো ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠন করতে। দস্যুর উত্তর থাকে তরবারির সঙ্গীতে! যাও!"

পরদিনের প্রভাত-সূর্যও পৃথিবীর বুকে বহিয়ে দিয়েছেন স্বর্ণ-রশ্মির বিপুল বন্যা। সূর্য হচ্ছেন আর্যাবর্তের দেবতা। আজও ভারত তাঁর স্তবের মন্ত্র ভোলে নি।

মহারাজা হস্তীর রাজ্যে সেদিন প্রভাতে কিন্তু স্তব জেগেছিল রণদেবতার। গম্-গমা-গম্ বাজছে ভেরী, ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ বাজছে তুরী, আর বাজছে অসি ঝন্-ঝনা-ঝন্! সূর্যকরে জ্বলন্ত বর্ম প'রে সশস্ত্র ভারতবীরবৃন্দ রাজপথে চরণতাল বাজিয়ে অগ্রসর হয়েছে, গৃহে গৃহে ছাদে ছাদে, বাতায়নে, অলিন্দে দাঁড়িয়ে ভারতের

বীরনারীরা লাজাঞ্জলি বৃষ্টি করতে করতে সানন্দে দিচ্ছেন উলুধ্বনি, দিচ্ছেন মঙ্গলশঙ্খে ফুৎকার! চলেছে রণহস্তীর শ্রেণী, চলেছে হ্রেষারব তুলে অশ্বদল, চলেছে ঘর্ঘর শব্দে যুদ্ধরথের পর যুদ্ধরথ! স্বাধীন ভারতের সে অপূর্ব উন্মাদনা আজও আমার সর্বাঙ্গে জাগিয়ে তুলছে আনন্দরোমাঞ্চ!

নগর-তোরণের বাইরে এসে দাঁড়াল তেজস্বী এক অশ্ব—মহারাজা হস্তীর সাদর উপহার! অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বলিষ্ঠ এক সৈনিক যুবক—বিপুল পুলকে তার মুখ-চোখ উদ্ভাসিত! সে সুবন্ধু।

আদর ক'রে অশ্বের গ্রীবায় একটি চাপড় মেরে সুবন্ধু বললে, "চল্‌রে রাজার ঘোড়া, বাতাসের আগে উড়ে চল, মহারাজা পুরুর

দেশে চল্, আমার বাপ-মায়ের কোলে ছুটে চল্! আজ বেজেছে এখানে যুদ্ধের বাজনা, কাল জাগবে পঞ্চনদের তীরে তীরে তরবারির

চীৎকার! চল্ রে রাজার ঘোড়া, বিদ্যুৎকে হারিয়ে ছুটে চল্—তোর সওয়ার আমি যে নিয়েছি মহাভারতকে জাগাবার ব্রত! আগে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করি, তারপর তোকে নিয়ে ফিরে আসবো আবার সৈনিকের স্বর্গ রণক্ষেত্রে! তারপর ভারতের জন্যে বুকের শেষ রক্তবিন্দু অর্ঘ্য দিয়ে হাসতে হাসতে সেই দেশে চ'লে যাবো—যে-দেশে গিয়েছে ভাগ্যবান বন্ধু চিত্ররথ, যে-দেশে গিয়েছে ভাগ্যবান বন্ধু পুরঞ্জন! চল্ রে রাজার ঘোড়া, উল্কার মতো ছুটে চল্!......

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন

ছুটে চলেছে তেজীয়ান ঘোড়া, যেন শরীরী ঝটিকা! পৃষ্ঠে আসীন সুবন্ধু, যেন তীব্র অগ্নিশিখা!

কখনো জনাকীর্ণ নগর, কখনো শান্ত গ্রাম, কখনো রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, কখনো দুর্গম অরণ্য এবং কখনো বা অসমোচ্চ পার্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়ে, পথ ও বিপথের উপর দিয়ে, সেতুহীন নদীর বুকের ভিতর দিয়ে সুবন্ধুর দুরন্ত ঘোড়া এগিয়ে চলল তুরন্ত গতিতে! দেখতে দেখতে সুদূরের মেঘস্পর্শী তুষারধবল পর্বতমালা দৃষ্টিসীমা থেকে মিলিয়ে গেল ক্ষীন হ'তে ক্ষীণতর স্বপ্নের মতো।

সুবন্ধু যেতে যেতে লক্ষ্য করলে, ইতিমধ্যেই এ-অঞ্চলের হাটে-মাঠে-বাটে নগরে গ্রামে বিষম উত্তেজনার সাড়া প'ড়ে গিয়েছে! অসংখ্য যবন সৈন্য নিয়ে বিদেশী দিগ্বিজয়ী আসছে ভারত-লুণ্ঠনে, এ দুঃসংবাদ এখানকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের মতো।

বীরত্ব-প্রকাশের নূতন অবসর পাওয়া গেল ব'লে নগরে নগরে বলিষ্ঠ যুবকরা তরবারি, বর্শা, বাণ ও কুঠার নিয়ে শান দিতে বসেছে বিপুল উৎসাহে; এবং উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করছে—একাধিক ভারত-শত্রুকে বধ না ক'রে তাদের কেউ প্রাণ দেবে না।

এক জায়গায় হঠাৎ অশ্ব থামিয়ে সুবন্ধু ব'লে উঠল, "না বন্ধু, না। তোমরা সকলেই যদি প্রাণ দিতে চাও, তাহ'লে ভারতের মঙ্গল হবে না।"

জনৈক যুবক সবিস্ময়ে বললে, "দেশের জন্যে আমরা প্রাণ দিতে চাই। প্রাণের চেয়ে বড় কি আছে মহাশয় ?"

সুবন্ধু বললে, "পারস্য-সম্রাট যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখনো ভারতীয় বীরেরা দলে দলে প্রাণ দিতে পেরেছিল—ভারতে কখনো প্রাণ দেবার জন্যে লোকের অভাব হয় নি। কিন্তু তবু পারস্যের কাছে উত্তর-ভারত পরাজিত হয়েছিল।......তোমরা অন্য প্রতিজ্ঞা করো।"

—"কি প্রতিজ্ঞা ?"

—"প্রতিজ্ঞা করো, যুদ্ধজয় না ক'রে, গ্রীকদের ভারত থেকে না তাড়িয়ে কেউ রণক্ষেত্র ত্যাগ করবে না। ভাই, প্রাণ দেওয়া সোজা, কিন্তু যুদ্ধজয় করা বড় কঠিন।"

সুবন্ধু আবার ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিলে।

যেতে যেতে আরো দেখলে, বৃদ্ধ শিশু ও নারীর দল নগর ত্যাগ ক'রে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলেছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে বিলাসী ধনী, কৃপণ ও কাপুরুষের দলও! সুবন্ধুর দুই চক্ষে জাগল ঘৃণাভরা ক্রোধ! অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মনে মনে বললে, "বিলাসী ধনী, কৃপণ, কাপুরুষ! পৃথিবীর অভিশাপ!"

মাঠে মাঠে দেখলে, দলে দলে চাষা ফসলভরা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে হাহাকারে ভরিয়ে তুলেছে আকাশ-বাতাস!

সুবন্ধুর মন করুণার বেদনায় ভ'রে উঠল। বললে, "হা হতভাগ্য চাষীর দল! এদের না আছে অর্থের শক্তি, না আছে অস্ত্রের শক্তি, না আছে বিদ্যার শক্তি! নাগরিক ধনী আর মহাজনরা এদের রাখে পায়ের তলায়, তবু এরা বিনিময়ে দেয় তাদের ক্ষুধার খোরাক। কঠিন পৃথিবীর শুকনো ধূলোমাটিকে স্নিগ্ধ সুন্দর ক'রে রচনা করে শ্যামল মহাকাব্য এই দরিদ্র মহাকবির দল। কিন্তু দেশে যখন যুদ্ধ বাধে তখন কি বিদেশী আর কি স্বদেশী সৈন্যেরা চ'লে যায় এদেরই

অপূর্ব রচনাকে নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে। সারা বছরের শ্রম আর আশা বিফল হয়ে যায় একদিনের যুদ্ধযাত্রায়,—চোখে জাগে কেবল অনাহার আর দুর্ভাগ্যের ছবি।"

পূর্বাকাশ ছেড়ে পশ্চিমের অস্তাচলে এসে সূর্যের রাঙামুখ ক্রমেই ম্লান হয়ে পড়ছে—আর অল্পক্ষণের মধ্যেই পাখীদের কণ্ঠে জেগে উঠবে বেলা-শেষের বিদায়ী সঙ্গীত।

অশ্বের পিঠ চাপড়ে সুবন্ধু বললে, "চল্‌রে রাজার ঘোড়া, আরো একটু তাড়াতাড়ি চল রে ভাই। অন্ধকারে অন্ধ হবার আগে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে যে।"

সন্ধ্যার কিছু আগেই পাওয়া গেল একটি গ্রামের প্রান্তে এক পান্থশালা। সুবন্ধু জানত, পনেরো ক্রোশের মধ্যে আর কোনো পান্থশালা বা নগর নেই। সুতরাং এইখানেই রাত্রিযাপন করবে ব'লে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

সেকালে সৈনিকের সব-চেয়ে প্রিয় ছিল অসি ও অশ্ব। নিজের শ্রান্তিকে আমলে না এনে সুবন্ধু আগে তাই তার অতি-শ্রান্ত ঘোড়ার পরিচর্যায় নিযুক্ত হ'ল। জল এনে তার সর্বাঙ্গের ধূলোকাদা ধুয়ে দিলে, তারপর তাকে দলন-মর্দন করতে লাগল।

পান্থশালার সমুখ দিয়ে যে প্রশস্ত রাজপথ চ'লে গিয়েছে তা এই গ্রামের নিজস্ব পথ নয়, কারণ মহারাজা পুরুর রাজ্য থেকে সীমান্তে যাবার জন্যে এইটিই হচ্ছে প্রধান পথ।

হঠাৎ দূর থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে সুবন্ধু চমকে মুখ তুলে দেখলে, পথের উপরে ধূলিমেঘের সৃষ্টি হয়েছে। সে কৌতূহলী চোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

তারপরই দেখা গেল একদল অশ্বারোহীকে। সংখ্যায় তারা পঞ্চাশজনের কম হবে না। কে এরা?

অশ্বারোহীর দলও পান্থনিবাসের সামনে এসে থামল। দলের পুরোভাগে ছিল যে অশ্বারোহী, ঘোড়া থেকে নেমে সে গম্ভীর স্বরে বললে, "কে এই পান্থশালার অধিকারী?" তার কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায়, এ ব্যক্তি আজন্ম আদেশ দিতে অভ্যস্ত।

অধিকারী সসম্ভ্রমে কাছে ছুটে গিয়ে নত হয়ে অভিবাদন করলে।

অশ্বারোহী তার দিকে তাকিয়েও দেখলে না। তেমনি হুকুমের স্বরে বললে, "আজ রাত্রে আমি এখানে থাকবো। আমার আর আমার লোকজনের থাকবার ব্যবস্থা করো।"

অধিকারী মৃদু স্বরে বললে, "আজ্ঞে, হঠাৎ এত লোকের ব্যবস্থা করি কি ক'রে?"

অশ্বারোহী মুহূর্তের জন্যে অধিকারীর মুখের দিকে তাকালে, অত্যন্ত অবহেলা-ভরে। সেই দুই চক্ষের দীপ্তি দেখেই অধিকারীর দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বার ক'রে অধিকারীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অশ্বারোহী অধীর স্বরে বললে, "যাও! নিজের মঙ্গল চাও তো প্রতিবাদ কোরো না।"

স্বর্ণমুদ্রাগুলি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে অধিকারী সেখান থেকে দ্রুতপদে স'রে পড়ল।

সুবন্ধু সবিস্ময়ে অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করতে লাগল। বয়স বোধহয় বিশ-বাইশের বেশী হবে না, কিন্তু তার দেহ এমন দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট যে, সহজে ধরা যায় না। উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ। ভাব-ভঙ্গি অসাধারণ সম্ভ্রান্তজনের মতো এবং মুখেচোখে অতুলনীয় প্রতিভা, বীরত্ব ও ব্যক্তিত্বের আভাস।

অশ্বারোহীর দৃষ্টি এতক্ষণ পরে সুবন্ধুর দিকে আকৃষ্ট হ'ল। কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণনেত্রে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তিনি

পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বললেন, "বন্ধু, দেখছি তুমি সৈনিক।"

সুবন্ধু অভিবাদন ক'রে হেসে বললে, "আজ্ঞে, আমাকে কেউ সুধু বন্ধু ব'লে ডাকে না, কারণ আমার নাম সুবন্ধু!"

—"তুমি সুবন্ধু কি কুবন্ধু জানিনা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বীর। আমার চোখ মিথ্যা দেখে না। কিন্তু তোমার কি আর কোন পরিচয় নেই?"

—"আমি ভারতসন্তান।"

—"সে গর্ব আমিও করতে পারি!"

—"আমার ব্রত ভারতকে জাগানো।"

—"আমারও ঐ ব্রত।"

—"তাই যদি হয়, তবে সীমান্তের দিকে না গিয়ে আপনি ফিরে আসছেন কেন? আপনি কি জানেন না, ভারতের রক্তপান করবার জন্যে সীমান্তে এসে হাজির হয়েছে যবন দিগ্বিজয়ী?"

মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত ক'রে অশ্বারোহী বললেন, "জানি সুবন্ধু! কারণ আমি আলেকজাণ্ডারের বন্ধুরূপে গ্রীক শিবিরেই ছিলুম!"

—সুবন্ধু সচমকে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে অসি কোষমুক্ত করতে উদ্যত হ'ল।

অশ্বারোহী হাস্যমুখে শান্ত স্বরে বললেন, "সুবন্ধু, তোমার তরবারিকে অকারণে ব্যস্ত কোরো না। আমি আলেকজাণ্ডারের বন্ধু হ'তে পারি কিন্তু ভারতের শত্রু নই! আমার নাম চন্দ্রগুপ্ত, নন্দবংশে জন্ম।

সুবন্ধু বিপুল বিস্ময়ে বললে, "মহারাজা নন্দ—"

বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "ও নাম আমার সামনে উচ্চারণ কোরোনা! তুমি কি জানো না, দুরাত্মা নন্দ প্রাচীন, পবিত্র

নন্দ-বংশের কেউ নয়? সে ক্ষৌরকার-পুত্র, ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে মগধের সিংহাসন লাভ করেছে?"*

সুবন্ধু থতমত খেয়ে বললে, "শুনেছি, রাজকুমার! কিন্তু—"

উত্তেজিত চন্দ্রগুপ্ত আবার তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "হাঁ, সেই পাপিষ্ঠ আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েছিল—কারণ আমি আসল রাজবংশের ছেলে আর প্রজারা আমাকে ভালোবাসে। তারই জন্যে আজ আমি ভবঘুরের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি! মগধের রাজ-সিংহাসন ক্ষৌরকার-পুত্রের কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি গিয়েছিলুম গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের কাছে সাহায্য চাইতে।"

সুবন্ধু ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "অর্থাৎ আপনি বিদেশী দস্যুকে যেচে দেশে ডেকে আনতে গিয়েছিলেন?"

চন্দ্রগুপ্ত দুই ভুরু সঙ্কুচিত ক'রে বললেন, "সুবন্ধু, আগে আমার সব কথা শোনো, তারপর মত প্রকাশ কোরো। ভেবে দেখো, নন্দের অধীনে আছে বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার যুদ্ধরথ আর চার হাজার রণহস্তী। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি আমার এমন সহায় সম্পদ নেই। তাই আমি আগে গ্রীকদের সাহায্যে আমার পূর্বপুরুষদের সিংহাসন উদ্ধার করতে চেয়েছিলুম। মহাপদ্ম নন্দের যে পুত্র এখন মগধের রাজা সে বিলাসী, অত্যাচারী, কুচরিত্র। তার উপরে নীচ বংশে জন্ম ব'লে প্রজারা তাকে ঘৃণা করে। বর্তমান নন্দ-রাজা যুদ্ধ-নীতিতেও অজ্ঞ। কাজেই গ্রীকদের সঙ্গে মগধের ন্যায্য রাজা আমাকে দেখলে সমস্ত প্রজা আর সৈন্যদল

---

* প্রাচীন সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষসে" ও আধুনিক বাংলা নাটক "চন্দ্রগুপ্তে" প্রকাশ, চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন শূদ্র বা দাসী-পুত্র। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা এ মতে সায় দেন না। তাঁরা বলেন চন্দ্রগুপ্ত আসল নন্দ-বংশেরই ছেলে এবং যে-নন্দকে তিনি রাজ্যচ্যুত করেছিলেন, শূদ্রের ঔরসে জন্ম হয়েছিল তাঁরই। ইতি—লেখক।

আমার পক্ষই অবলম্বন করত, নন্দ যুদ্ধ করলেও জিত্‌তে পারত না। তারপর একবার সিংহাসনে বসতে পারলেই আমি আমার স্বাধীনতা ঘোষণা করতুম। তখন স্বদেশ থেকে অত দূরে—পূর্বভারতের প্রায় শেষ-প্রান্তে গিয়ে প'ড়ে, আমার বিপুল বাহিনীর সামনে গ্রীকদের কি শোচনীয় অবস্থা হ'ত, বুঝতে পারছ কি ? আমি কেবল ভারতীয় যুদ্ধরীতিতে নয়, গ্রীক যুদ্ধরীতিতেও অভিজ্ঞ। গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'লে আমি তাদের রীতিই গ্রহণ করতুম। আরো একটা ভাববার কথা আছে। আজ গ্রীকরা দলে ভারি বটে, কিন্তু তারা যখন কাবুল থেকে সুদূর মগধে গিয়ে পৌঁছত, তখন পথশ্রমে আর ধারাবাহিক যুদ্ধের ফলে তাদের অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য মারা পড়ত। সে-অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেও তারা আমার স্বাধীনতায় বাধা দিতে সাহস করত না।......এখন বুঝলে সুবন্ধু, কেন আমি গ্রীক দস্যুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়েছিলুম ? আমি চেয়েছিলুম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে !"

সুবন্ধু বললে, "আপনার অসাধারণ বুদ্ধি দেখে বিস্মিত হচ্ছি। কিন্তু আলেকজাণ্ডার কি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে ?"

—"আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি, বোধহয় আমার মনের কথা ধ'রে ফেলেছেন। গর্বিত স্বরে আমাকে বলেছেন 'চন্দ্রগুপ্ত, আমি যখন মগধ আক্রমণ করবো, নিজের ইচ্ছাতেই করবো। তোমার সাহায্য অনাবশ্যক।' ধূর্ত যবন ফাঁদে পা দিলে না।"

—"এখন আপনি কোথায় চলেছেন ?"

—"মগধের রাজধানী পাটলি পুত্রে।„

—"পাটলিপুত্রে !"

—"হাঁ। শত্রুর কাছে যাচ্ছি ব'লে বিস্মিত হোয়ো না। এক গুপ্তচরের মুখে খবর পেলুম, মগধের প্রজারা নন্দের অত্যাচার আর

সইতে না পেরে প্রকাশ্য বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। তাদের পরামর্শদাতা হচ্চেন বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) নামে এক কূটনীতিতে অভিজ্ঞ শক্তিশালী ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুগুপ্ত আমাকে বিদ্রোহীদের নেতা হবার জন্যে আহ্বান করেছেন। তাই আমি দেশে ফিরছি আর পথে যেতে যেতে সাধ্যমত সৈন্য সংগ্রহ করছি। সুবন্ধু, এই অল্প পরিচয়েই আমি বুঝেছি তুমি বীর, বুদ্ধিমান, স্পষ্টবক্তা। তোমার মতন সৈনিক লাভ করা সৌভাগ্য। তুমিও আমার সঙ্গী হবে?"

সুবন্ধু আবার অভিবাদন ক'রে বললে, "মগধের ভবিষ্য নরপতি, আমি আপনার জয় কামনা করি। কিন্তু ক্ষমা করবেন, আপাতত মগধের গৃহযুদ্ধে যোগ দেবার অবসর আমার নেই। আমার সামনে রয়েছে এখন মহত্তর কতব্য!"

—"কর্তব্য সুবন্ধু?

—"গ্রীকদের আগমন-বার্তা নিয়ে আমি চলেছি দেশ জাগাতে জাগাতে মহারাজা পুরুর কাছে। সীমান্তে গ্রীকদের বাধা দেবার জন্যে মহারাজা হস্তী আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, মহারাজা পুরুর কাছে তিনি সাহায্য চান।"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "তাহ'লে যাও সুবন্ধু, তুমি তোমার কতব্য পালন করো। কিন্তু তুমি আমার একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখ।"

—"আদেশ করুন।"

—"এই গ্রীক দিগ্বিজয়ীকে তুমি চেনো না। তিনি কেবল লক্ষাধিক সৈন্যের নেতা নন, রণনীতিতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তিনি কিছুতেই মহারাজা পুরুর সঙ্গে মহারাজ হস্তীর মিলন ঘটতে দেবেন না। মহারাজা পুরু প্রস্তুত হবার আগেই তিনি তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে যেমন ক'রে পারেন মহারাজা হস্তীকে পরাস্ত করবেনই। তারপর তিনি করবেন মহারাজ পুরুর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে আক্রমণ—আমি মহারাজার সৈন্যবল জানি। লক্ষাধিক

গ্রীকের সামনে পঞ্চাশ হাজার ভারতবাসী কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে ?”

—“তাহলে আপনি কি বলেন রাজকুমার, ভারতবাসীরা নিশ্চেষ্ট ভাবে ব’সে ব’সে করুণ নেত্রে দেখবে, তাদের স্বদেশের বুকের উপর দিয়ে বিদেশী যবনদের উন্মত্ত বিজয়-যাত্রা ? সে দৃশ্যটা খুব জমকালো হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের—আমাদের পুরুষত্বের মর্যাদা কোথায় থাকবে ?

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, “না সুবন্ধু, আমি তা বলি না। নিশ্চেষ্টভাবে দাসত্ব-শৃঙ্খল পরার চেয়ে মানুষের বড় কলঙ্ক আর নেই। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। আমার চোখের সামনে যদি একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন না থাকত, তাহ’লে আমিও আজ বীরের মতন প্রাণ দেবার জন্যে মহারাজ পুরুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতুম।”

“—সে কী স্বপ্ন রাজকুমার ?”

সুদূর দিকচক্রবাল-রেখায় যেখানে পশ্চিম আকাশের আলোক-নেত্র ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয়ে আসছে, সেই দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে চন্দ্রগুপ্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর পরিপূর্ণ দৃপ্ত স্বরে বললেন, “অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। এই গ্রীক ঝটিকা থেকে যদি আত্মরক্ষা করতে পারো তাহ’লে তুমি দেখে নিও সুবন্ধু, মগধের সিংহাসন অধিকার করতে পারলে আমার বাহু বিস্তৃত হবে হিন্দুকুশের শিখর পর্যন্ত। মগধের অগাধ সৈন্য-সাগরের মধ্যে মুষ্টিমেয় গ্রীক দস্যুরা যাবে অতলে তলিয়ে। সমগ্র বিচ্ছিন্ন ভারতকে আমি একত্রে দাঁড় করাবো এক বিশাল রাজছত্রতলে।”

—“আপনার উজ্জ্বল স্বপ্ন সত্য হোক্ সার্থক হোক্। কিন্তু তার আগেই মহারাজা পুরু যদি গ্রীকদের পরাজিত করেন ?”

—“তাহ’লে অসম্ভবকে সম্ভবপর করেছেন ব’লে মহাবীর পুরুকে আমি অভিবাদন করবো।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার ইতিহাস

আলেকজাণ্ডার কি উপায়ে উত্তর-ভারতের পশ্চিম অংশ জয় করেছিলেন, সে ইতিহাস এখানে সবিস্তারে বলবার দরকার নেই। ইস্কুলে প্রত্যেক ছেলেই সে কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। আমরা কেবল এখানে গুটিকয় ইঙ্গিত দিতে চাই।

পূর্ব-পরিচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্তের যে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছে, তাইই সত্য হ'ল! যুদ্ধরীতিতে পরিপক্ক আলেকজাণ্ডার মহারাজা পৌরব বা পুরুর আগমনের আগেই হস্তীকে আক্রমণ করলেন। ছোট রাজ্যের রাজা হস্তী, সৈন্যবল তাঁর সামান্য, বিপুল গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দেবেন কেমন ক'রে? তবু তিনি অসম্ভবও সম্ভব করেছিলেন, বালির বাঁধে সমুদ্রকে ঠেকিয়ে রাখার মতো সুদীর্ঘ একমাসকাল গ্রীকদের এগুতে দেননি ভারতের বুকের ভিতরে!

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর মধ্যে মহারাজ পুরু প্রস্তুত হ'তে পারলেন না।

কেবল স্বদেশ-প্রীতি ও বীরত্বের দ্বারা যুদ্ধজয় করা যায় না, অসংখ্য শত্রুকে বাধা দেবার জন্যে চাই প্রচুর সৈন্যবল—মহারাজ হস্তীর যা ছিল না। ফলে যা হবার তাই হ'ল, মহাসাগরে মিলিয়ে গেল ক্ষুদ্র নদী,—গ্রীকদের সম্মিলিত কণ্ঠের জয়নাদে ভারত-প্রান্তের আকাশ-বাতাস, পাহাড়, নগর ও অরণ্য কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। এর পর মহাবীর হস্তীর পরিণাম কি হ'ল ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব।

খুব সম্ভব, যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্ত তরবারি নাচিয়ে তিনি বীরের কাম্য মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

হতভাগ্য দেশ ভারতবর্ষ! এমন এক ঐতিহাসিক বীরের নির্ভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানের কাহিনী আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি। রাজা হস্তী অন্য দেশে জন্মালে যুগে যুগে শত শত কবি ও ঔপন্যাসিকের কল্পনা তাঁর অমর নাম নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। কোথায় দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সর্বজয়ী বিরাট বাহিনী, আর কোথায় এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজা হস্তীর মুষ্টিমেয় সৈন্যদল! পতঙ্গ যেন মাতঙ্গকে একমাস শক্তিহীন ক'রে রেখেছিল! এই আশ্চর্য বীরত্ব-গাথা আমরা শুনতে পেয়েছি কেবল গ্রীক ঐতিহাসিকের মুখেই। কিন্তু ভারতের কেউ তাঁর নাম মনে রাখেনি, অথচ ভারতের নির্ভরযোগ্য সত্যিকার ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম বীর হচ্ছেন মহারাজা হস্তী! তাঁর আগে পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি বীরের কথা আমরা শুনি বটে, কিন্তু তাঁরা ঐতিহাসিক যুগের কেউ নন। কবির কল্পনা ব'লে কেউ তাঁদের উড়িয়ে দিলে জোর ক'রে প্রতিবাদ করবার উপায় নেই।

অভিসারের মহারাজাও পুরুর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন, কিন্তু মহারাজা হস্তীর পরিণাম দেখে ভয়ে ভয়ে তিনি আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সন্ধি ক'রে ফেললেন।

আলেকজাণ্ডার সীমান্তের কোনো রাজাকেই অন্য রাজাদের সঙ্গে মিলে শক্তিবৃদ্ধি করতে দিলেন না, নিজের বৃহত্তর বাহিনী নিয়ে একে একে তাদের প্রত্যেককেই পরাস্ত করলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা এই সব হিন্দু রাজা ও রাজ্যের নাম করেছেন বটে, কিন্তু বিদেশী ভাষার কবলে প'ড়ে ঐ-সব নাম এতটা বিকৃত হয়েছে যে, সেগুলিকে ভারতীয় নাম ব'লে চেনবার কোনো উপায়ই নেই। বড় বড় পণ্ডিতও এ-কাজে হার মেনেছেন।

তবে অসংখ্য সৈন্যের অধিকারী হয়েও আলেকজাণ্ডারের ভারতীয় যুদ্ধযাত্রা মোটেই নিরাপদ হয় নি। তিনবার তাঁকে আহত হ'তে হয়েছিল। প্রথম দুইবার ভারতের উত্তর সীমান্তে এবং শেষ-বার মূলতানে—যখন তিনি ভারত-জয়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করছিলেন। শেষ-বারের আঘাত এমন সাংঘাতিক হয়েছিল যে, আলেকজাণ্ডারের জীবনের আশাই ছিল না।

এই তিনবারই আলেকজাণ্ডার হাজার হাজার বন্দীকে হত্যা ক'রে নির্দয় ও অমানুষিক প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বারের হত্যা-কাণ্ডের জন্যে গ্রীক ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার সমর্থন করতে পারেন নি।

মাসাগা (সম্ভবত আধুনিক মালাকাণ্ড গিরিসঙ্কটের উত্তরে) নগরে সাতহাজার পেশাদার ভারতীয় সৈন্য ছিল। তারা চাকরির খাতিরে সেখানে গিয়েছিল ভারতের সমতল প্রদেশ থেকে। মাসাগা নগরের পতনের পর তারা যখন আত্মসমর্পণ করে, আলেকজাণ্ডার তাদের আশ্রয় দিয়ে গ্রীক ফৌজে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু সেই সাত-হাজার হিন্দুবীর একবাক্যে বললে, "আমরা পেশাদার সেপাই বটে, কিন্তু বিদেশীর অধীনে চাকরী নিয়ে স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারবো না। আমরা দেশে ফিরে যাবো।"

আলেকজাণ্ডার তখন তাদের কিছু বললেন না। কিন্তু রাত্রে তারা যখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে, তখন হঠাৎ অসংখ্য সৈন্য নিয়ে গোপনে তাদের আক্রমণ করলেন। ঘুম ভাঙবার আগেই তাদের অনেকে বিশ্বাসঘাতকদের তরবারির আঘাতে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হ'ল। বাকি সবাই বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে পরিবারবর্গকে ঘিরে দাঁড়াল তরবারি হস্তে, সগর্বে! দৃঢ়স্বরে তারা বললে, "প্রাণ দেবো, তবু দেশের শত্রুর অধীনে চাকরী করবো না!" সেই সাত হাজার হিন্দু বীর সেদিন

একে একে লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছিল—গ্রীক রক্তে ভারতের মাটি রাঙা ক'রে! বলতে আজও আমার বুক ফুলে উঠছে যে, অতীতের সেই গৌরবময় দিনে হিন্দু বীরবালারাও গ্রীক সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করেছিলেন! এ উপন্যাসের কথা নয়, গ্রীক ঐতিহাসিকের কথা!

.........সীমান্তের পথ হ'ল নিষ্কণ্টক!

আলেকজাণ্ডার বললেন, "চলো এইবার পঞ্চনদের দেশে। রাজা পুরু সেখানে প্রস্তুত হচ্ছে, তার অধীনে আছে মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। তাকে মারতে পারলেই সমস্ত ভারত লুটিয়ে পড়বে আমাদের পায়ের তলায়।"

পুরুর সৈন্যসংখ্যা যে পঞ্চাশ হাজারের বেশী ছিল না, এ-বিষয়ে মতান্তর নেই। কিন্তু ভারতের গৌরব খর্ব করবার জন্যে কিনা জানি না, আধুনিক য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা আলেকজাণ্ডারের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিল ব'লে জানাবার চেষ্টা করেন। ভারতের নিজের ইতিহাস—অন্তত আসল ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা নেই, তাই আমরা আধুনিক য়ুরোপের কথা অমূলক ব'লে প্রতিবাদ করতে পারি না।

কিন্তু আধুনিক য়ুরোপের এই চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছেন দিগ্বিজয়ী গ্রীকদেরই প্রাচীন লেখক। প্লুটার্কের লেখা আলেকজাণ্ডারের জীবনীতে আমরা অন্য কথা পাই। কারণ তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, একলক্ষ বিশ হাজার পদাতিক ও পনেরো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

তারপর অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন যে, তক্ষশীলার রাজা অম্ভি, অভিসারের রাজা ও অন্যান্য বশীভূত রাজারাও আলেকজাণ্ডারকে সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব দিয়ে সাহায্য করেছিলেন; এবং আলেকজাণ্ডার নিজেও যে-পথে আসতে আসতে পেশাদার

সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন, পূর্ব-উক্ত মাসাগার হত্যাকাণ্ডেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। মাসাগার সাত হাজার বীরের মৃত্যুর একমাত্র কারণ, তারা গ্রীক ফৌজে যোগ দিতে চায় নি। তাদের মতন স্বদেশ-ভক্ত পৃথিবীর সব দেশেই দুর্লভ। সুতরাং এ-কথা জোর ক'রে বলা যায় যে, ভারতের হাজার হাজার পেশাদার সৈন্যও আলেকজাণ্ডারের বাহিনীকে ক'রে তুলেছিল বৃহত্তর। আমাদের মতে, আলেকজাণ্ডার যখন পুরুর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হন, তখন তাঁর অধীনে অন্তত তুই লক্ষের কম সৈন্য ছিল না,—বরং এর উপরে আরো পঞ্চাশ হাজার যোগ করলেও অত্যুক্তি হবে না।

পুরুর দুর্ভাগ্য! যথাসময়ে প্রস্তুত হ'তে পারেন নি ব'লে তাঁকে একাকীই অন্তত চারগুণ বেশী গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'ল। বুদ্ধিমান হ'লে পুরুও অন্যান্য রাজাদের মতন আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করতে পারতেন। কিন্তু পুরুর বিরাট বক্ষের তলায় ছিল ভীমার্জুনের আত্মা, বিনা যুদ্ধে তিনি স্বদেশকে যবনের হাতে তুলে দিতে রাজি হ'লেন না।

পুরু মহাবীর হ'লেও আমাদের এই কাহিনীর নায়ক নন, কাজেই তাঁর কথা সবিস্তারে ব'লে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, খৃষ্ট-পূর্ব ৩২৬ অব্দে জুলাই মাসের প্রথমে, ঝিলাম নদের তীরে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে-যুদ্ধে পুরু পরাজিত হন, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের মত মেনে তাকে আমরা মহাযুদ্ধ ব'লে স্বীকার করতে পারবো না। পরে পানিপথের একাধিক যুদ্ধে সমগ্র ভারতের ভাগ্য যেমন বার বার পরিবর্তিত হয়েছিল, ঝিলামের যুদ্ধের পরে তেমন কিছুই হয় নি, ভারতবর্ষের অধিকাংশই ছিল আলেকজাণ্ডারের নাগালের বাইরে। তার প্রধান কারণ, পুরু ছিলেন উত্তর-ভারতের মাত্র এক অংশের রাজা, তাঁর পতনের সঙ্গে সমগ্র ভারতের বিশেষ যোগ ছিল না।

ঝিলামের যুদ্ধে মহাবীর ও অতিকায় পুরু অসম্ভবের বিরুদ্ধেও প্রাণপণে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু শেষটা দেহের নয় স্থানে আহত হয়ে প্রায়-মূর্ছিত অবস্থায় বন্দী হ'লেন। আলেকজাণ্ডারের শিবিরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাঁর সেই সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ বিপুল

দেহের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে কি-রকম্ ব্যবহার করবো?"

পুরু সগর্বে মাথা তুলে বললেন, "এক রাজা আর এক রাজার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন!"

পুরুর বীরত্ব ও পরাক্রম দেখে আলেকজাণ্ডার এতটা অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি কেবল তাঁকে মুক্তি দিলেন না, তাঁর নিজের রাজ্যের উপরেও আরো অনেক দেশ দান করলেন।

পঞ্চনদের তীরে উড়তে লাগল গ্রীক দিগ্বিজয়ীর পতাকা! কিন্তু আলেকজাণ্ডার বুঝলেন, তিনি এখনো বৃহত্তর ভারতসীমান্তেই দাঁড়িয়ে আছেন।

যুদ্ধজয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস যখন কমল', আলেকজাণ্ডার তখন একদিন সেনাপতিদের আহ্বান ক'রে বললেন, "সৈন্যদের মধ্যে প্রচার ক'রে দাও, আমি এইবারে মগধের দিকে যাত্রা করবো!"

গ্রীক অশ্বারোহী সৈন্যদের নেতা স্পষ্টবক্তা কইনোস্ সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি সম্রাট! আজ আট বৎসর হ'ল আমরা স্বদেশ থেকে বেরিয়েছি। এখনো আপনি এগিয়ে যেতে চান?"

—"হাঁ সেনাপতি! কারণ মগধের রাজাই হচ্ছেন ভারতের সব-চেয়ে বড় রাজা। মগধ জয় করতে না পারলে ভারত জয় করা হবে না।"

অন্যান্য সেনাপতিরাও জানালেন, গ্রীক সৈন্যদের অধিকাংশই হত বা আহত হয়েছে। এখন আর আমাদের মগধের দিকে যাবার সাহস নেই। এর মধ্যেই গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

কইনোস্ বললেন, "শুনেছি মগধের নন্দ-রাজার সৈন্য আছে লক্ষ লক্ষ। মগধ আক্রমণ করলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য।"

আলেকজাণ্ডার আর কোনো কথা না ব'লে অভিমানভরে চ'লে গেলেন। দুই দিন আর শিবিরের ভিতর থেকে বেরুলেন না।

মাথা ঠাণ্ডা ক'রে অনেক ভেবে, তৃতীয় দিনে বাইরে এসে বললেন, "তাঁবু তোলো! আমরা গ্রীসে ফিরে যাবো।"

আধুনিক য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করতে এসে গ্রীকদের এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হচ্ছে পলায়নেরই নামান্তর। জীবনে আর কখনো আলেকজাণ্ডার এমন ভাবে পিছু হটেন নি। প্রাচীন ঐতিহাসিক দায়াদরাস্ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, (মেগাস্থেনেসের ভ্রমণকাহিনীর আলোচনা-প্রসঙ্গে) "মাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার সবাইকে হারিয়েও মগধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহসী হন নি। মগধের সৈন্যবলের কথা শুনে তিনি ভারত-জয়ের ইচ্ছা দমন করেন!"

আলেকজাণ্ডার তো উত্তর ভারতের চতুর্দিকে গ্রীক সৈন্য, সেনাপতি ও শাসনকর্তা রেখে মানে মানে স'রে পড়লেন, কিন্তু আমাদের বন্ধু সুবন্ধুর কি হ'ল? এইবারে তার সঙ্গে দেখা ক'রে আবার গল্পের সূত্র ধরবো!

নবম পরিচ্ছেদ

আনন্দের অশ্রুজল

"সেনাপতি, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আর আমাদের সঙ্গে কষ্ট ক'রে আসতে হবে না! আমরাই আপনার আদেশ পালন করতে পারবো।"

—"না বসুমিত্র, ব্যাপারটাকে তোমরা সামান্য মনে কোরো না। আমরা শৃগাল মারতে নয়, যাচ্ছি সিংহ শিকার করতে! আমরা একবার বিফল হয়েছি আবার বিফল হ'লে আমার মান আর রক্ষা পাবে না। ঘোড়ায় চড়ো, অগ্রসর হও!"

একশোজন সওয়ার চালিয়ে দিলে একশো ঘোড়াকে! একশো ঘোড়ার খুরের শব্দে রাজপথ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল—নিবিড় মেঘের মতো ধুলায় ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চতুর্দিক এবং সৈনিকদের বর্মে বর্মে জ্বলতে লাগল শত সূর্যের চমক!

অরণ্যের বক্ষ ভেদ ক'রে চ'লে গিয়েছে প্রশস্ত সেই পথ। মাঝে মাঝে গ্রাম। সৈনিকদের ঘোড়া এত দ্রুত ছুটেছে যে মনে হচ্ছে, গ্রামগুলো যেন কৌতূহলের আগ্রহে কাছে এসেই আবার সশস্ত্র সওয়ারদের দেখে ভয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি!

প্রায় ক্রোশ-তিনেক পরে পথটা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে চ'লে গিয়েছে! বসুমিত্র যাঁকে সেনাপতি ব'লে সম্বোধন করেছিল হঠাৎ তিনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধ'রে হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন, "সবাই ঘোড়া থামাও!"

একশো ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

সেনাপতি বললেন, "দেখো বসুমিত্র, তিনটে পথই কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরের তিনদিকে গিয়ে পড়েছে। পঁচিশজন সওয়ার ডানদিকে যাক্, আর পঁচিশজন যাক্ বাম দিকে। বাকি পঞ্চাশজনকে নিয়ে আমি যাবো সাম্‌নের পথ ধ'রে। গুপ্তচরের খবর যদি ঠিক হয়, তাহ'লে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরেই আমাদের শিকারকে ধরতে পারবো। সে ধূ-ধূ- প্রান্তরের মধ্যে কেউ আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।"

বসুমিত্র সেনাপতির হুকুম সকলকে জানালে। তখনি সওয়াররা তিন দলে বিভক্ত হয়ে আবার গন্তব্য পথে অগ্রসর হ'ল। পাঠকদের সঙ্গে আমরাও যাই সেনাপতির সঙ্গে!

ঘণ্টা-দুই পরেই পথ গেল ফুরিয়ে এবং আরম্ভ হ'ল পবিত্র কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ প্রান্তর। হাঁ, এ প্রান্তর পবিত্র এবং ভয়াবহ! মহাভারতের অমর আত্মা একদিন এখানে যত উচ্চে উঠেছিল, নেমেছিল আবার ততখানি নীচে! ভারতের যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মন্দ এবং যা-কিছু বিশেষত্ব, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের মধ্যেই করেছিল আত্মপ্রকাশ। নরের সঙ্গে নারায়ণের মিতালি, শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতার বাণী, ভীমার্জুনের অতুলনীয় বীরত্ব, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মানবতা, কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃবিরোধ, অন্যায় যুদ্ধে ভীষ্মের, দ্রোণের ও অভিমন্যুর পতন প্রভৃতির শত শত কাহিনী যুগ-যুগান্তরকে অতিক্রম ক'রে আজও ভারতের জীবন-স্মৃতির ভিতরে দুলিয়ে দিচ্ছে বিচিত্র ভাবের হিন্দোলা! মানুষ যে কখনো দেবতা হয় এবং কখনো হয় দানব, কুরুক্ষেত্রেই আমাদের তা দেখিয়ে দিয়েছে। বহুকাল আগে আমি একবার দাঁড়িয়েছিলুম গিয়ে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। কিন্তু সেখানে গিয়েই মনে হ'ল, এ তো প্রান্তর নয়,—এ-যে রক্তে রাঙা সমুদ্র! কুরুক্ষেত্রের প্রত্যেক ধূলিকণাকে ভারতের মহাবীররা স্মরণাতীত কাল আগে যে রক্তের ছাপে আরক্ত ক'রে গিয়েছিলেন,

বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতাও তা বিলুপ্ত করতে পারে নি। আর আমরা যে-যুগের কথা বলছি সে-যুগে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের যুদ্ধে-মৃত লক্ষ লক্ষ বীরের কঙ্কাল ধূলায় ধূলা হবারও সময় পায় নি! সে বিপুল প্রান্তরে রাত্রে তখন কোনো পথিকই চলতে ভরসা করত না।······এ-যুগেও সেখানে গিয়ে আমি প্রাণের কানে শুনেছি, শত পুত্রের শোকে দেবী গান্ধারীর কাতর আর্তনাদ, অভিমন্যুর শোকে বিধবা উত্তরার কান্না এবং শর-শয্যায় শায়িত ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস!

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের তিন দিকে ছুটছে তিন দল অশ্বারোহী। খানিক অগ্রসর হয়েই তারা দেখতে পেলে, দূরে মৃদু-কদমে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে একজন সওয়ার।

সে আমাদের বন্ধু—ভারতের বন্ধু সুবন্ধু। কেউ যে তার পিছনে আসছে এটা সে অনুমান করতে পারে নি, তাই তার ঘোড়া অগ্রসর হচ্ছে ধীরে ধীরে। সন্দেহ করবার কোন হেতু ছিল না কারণ উত্তর-পশ্চিম ভারত আজ যবন গ্রীক দিগ্বিজয়ীর কবলগত, মহারাজা হস্তীর পতন হয়েছে এবং আলেকজাণ্ডারের প্রধান শত্রু মহারাজা পুরু আজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শক্তিহীন। ভারতের তরবারি কোষবদ্ধ!

আচম্বিতে পিছনে বহু অশ্বের পদশব্দ শুনে সুবন্ধু ঘোড়া থামিয়ে ফিরে দেখলে। কিন্তু তখনো সে আন্দাজ করতে পারলে না যে, ওরা অসছে তাকেই ধরবার জন্যে! ভাবলে, এই ভারতীয় সওয়ারের দল যাচ্ছে অন্য কোন কাজে।

খানিক পরেই সওয়ারের দল যখন খুব কাছে এসে পড়ল তখন সে বিস্মিত নেত্রে দেখলে, সকলকার আগে আগে আসছে ভারতের কুপুত্র, আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি ও পথ-প্রদর্শক শশীগুপ্ত।

সুবন্ধুর মনে কেমন সন্দেহ হ'ল। সে তাড়াতাড়ি নিজের অশ্বের গ্রীবায় করাঘাত ক'রে বললে, "চল্ রে রাজার ঘোড়া, বিশ্বাস-ঘাতকের ছায়া পিছনে ফেলে হাওয়ার আগে উড়ে চল্!"

তার ঘোড়ার গতি বাড়তেই পিছন থেকে শশীগুপ্ত চেঁচিয়ে বললে, "ঘোড়া থামা ও সুবন্ধু! আর পালাবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই! ডানদিকে চেয়ে দেখো, বাঁ-দিকে চেয়ে দেখো! তোমাকে আমরা প্রায় ঘিরে ফেলেছি!"

সত্য কথা! হতাশ হয়ে সুবন্ধু একটা বড় গাছের তলায় গিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল।

শশীগুপ্তও ঘোড়া থেকে নেমে প'ড়ে বললে, "বসুমিত্র, সুবন্ধুকে বন্দী করো!"

সুবন্ধু বললে, "যুদ্ধের পালা শেষ হয়েছে, আলেকজাণ্ডার দেশের পথে ফিরে গেছেন! সেনাপতি, এখন আমাকে বন্দী ক'রে আপনাদের কি লাভ হবে?"

মৃদু হাস্য ক'রে শশীগুপ্ত বললে, "কি লাভ হবে? তুমি কি জানো না, সম্রাট আলেকজাণ্ডারের অনুগ্রহে আমি এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের শাসনকর্তার পদ পেয়েছি? ভারতে গ্রীক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোথায় কে কোন্ চক্রান্ত করছে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে আমার আর এক কর্তব্য!"

সুবন্ধু বললে, "সেনাপতি শশীগুপ্তের কাছে যে যবনের অন্ন-জল অত্যন্ত পবিত্র, এ-সত্য আমার অজানা নেই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?"

শশীগুপ্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "কার অন্ন-জল পবিত্র, সে কথা আমি এক নগণ্য সৈনিকের মুখে শুনতে ইচ্ছা করি না।"

সুবন্ধু হাসতে হাসতে বললে, "আমি যে নগণ্য সৈনিক মাত্র, সে-সত্যও আমার অজানা নেই। কিন্তু নগণ্য সৈনিককে বন্দী করবার

জন্যে আপনার মতো গণ্যমান্য মহাপুরুষকে সসৈন্যে আসতে হয়েছে কেন সে-কথাটা আমাকে স্পষ্ট ক'রে বললে খুসি হবো।"

—"কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

—"মগধে।"

—"কেন?"

—"যবন-সাম্রাজ্যে সুবন্ধু বাস করে না!"

—"তোমার উত্তর সত্য নয় সুবন্ধু! গ্রীকদের বিরুদ্ধে তুমি মহারাজা হস্তীকে আর মহারাজা পুরুকে উত্তেজিত করেছিলে। এইবারে তুমি মগধে গিয়েও বিদ্রোহ প্রচার করতে চাও।"

—"সেনাপতি শশীগুপ্ত, বিদ্রোহ আমাকে আর প্রচার করতে হবে না। আলেকজাণ্ডার এখনো ভারতের মাটি ছাড়েন নি, এরি মধ্যে তো চারিদিকেই উড়ছে বিদ্রোহের ধ্বজা! পুষ্কলাবতীর গ্রীক শাসনকর্তা নিকানর নিহত হয়েছে, কান্দাহারও করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা! আপনার অবস্থাও নিরাপদ নয়, তাই আপনি গ্রীক সম্রাটের কাছে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করেছেন! কিন্তু নূতন গ্রীক সৈন্য আর আসবে না সেনাপতি, আলেকজাণ্ডার এখন নিজেই কাবু হয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত!"

—"ও-সব কথা আমি তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি, মহারাজা পুরু যুদ্ধে হেরেছেন বটে, কিন্তু আজও পোষ মানেন নি। তিনি খাপ্ থেকে আবার তরবারি খুলতে চান, আর সেই খবর দেবার জন্যেই তুমি ছুটেছ মগধে! কিন্তু তোমার বাসনা পূর্ণ হবে না।"

সুবন্ধু আবার হাসির ঢেউ তুলে বললে, "আপনি আমাকে বন্দী করতে পারবেন?"

—"সে বিষয়েও তোমার সন্দেহ আছে নাকি? চেয়ে দেখো, আমরা একশোজন!"

—"হিন্দুকুশের ছায়ায় আমার দুই বন্ধু ক'জন গ্রীককে বাধা দিয়েছিল, এরি মধ্যে সে কথা ভুলে গেলেন নাকি ?"

—"আমি ভুলি নি। কিন্তু তুমিও ভুলে যেয়ো না, শেষ পর্যন্ত তাদের মরতেই হয়েছিল !"

—"হাঁ, সেই কথাই বলতে চাই। জানি আমিও মরবো। কিন্তু শশীগুপ্ত, আমি আত্মসমর্পণ করবো না।"

সুবন্ধু অশ্রদ্ধাভরে তাকে নাম ধ'রে ডাকলে ব'লে অপমানে শশীগুপ্তের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। চীৎকার ক'রে বললে, "বসুমিত্র ! সুবন্ধুকে বন্দী করো।"

—"আমি তো মরবোই, কিন্তু তার অনেক আগেই ঘরের শত্রু বিভীষণকে বধ করবো!" চোখের নিমেষে সুবন্ধু বাঘের মতন লাফ মেরে একেবারে শশীগুপ্তের গায়ের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জ্বলন্ত অসি কোষমুক্ত হয়ে শশীগুপ্তের মাথার উপরে করলে বিদ্যুৎ-চিত্রের সৃষ্টি।

কিন্তু বসুমিত্রের সাবধানতায় শশীগুপ্ত সে-যাত্রা বেঁচে গেল প্রাণে প্রাণে। বসুমিত্র জাগ্রত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি তুলে সুবন্ধুর তরবারিকে বাধা দিলে।

শশীগুপ্ত সভয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বিষম রাগে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "বধ করো—বধ করো! ওকে কুচি-কুচি ক'রে কেটে ফ্যালো!"

একশো ঘোড়ার সওয়ারের হাতে হাতে অগ্নিবৃষ্টি করলে এক শত তরবারি! সুবন্ধু দুই পা পিছিয়ে এসে গাছের গুড়ির উপরে পৃষ্ঠ-রক্ষা ক'রে তরবারি তুলে তীব্র স্বরে বললে, "হাঁ! আমাকে বধ করো! কিন্তু বন্দী আমি হবো না! নিজে মরবো—শত্রু মারবো।"

বসুমিত্র কিন্তু সেনাপতির হুকুম তামিল করবার জন্যে কোনো আগ্রহই দেখালে না। প্রান্তরের এক দিকে চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে সে বললে, "সেনাপতি, পূর্বদিকে চেয়ে দেখুন।"

পূর্বদিকে চেয়েই শশীগুপ্ত সচকিত স্বরে বললে, "ও কারা বসুমিত্র? ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকেই আসছে? ওদের পোষাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা এ-অঞ্চলের কোনো দেশের সৈন্য নয়! ওরা কারা, বসুমিত্র?"

বসুমিত্র উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না! একটা অগ্রবর্তী দল আসছে, গুণ্‌তিতে চার-পাঁচশোর কম হবে না! কিন্তু ওদের পিছনে, আরো দূরে তাকিয়ে দেখুন সেনাপতি, পূর্বদিকে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর ভ'রে গিয়েছে সৈন্যে সৈন্যে! সংখ্যায় ওরা হাজার-কয় হবে! পূর্ব-দক্ষিণ-প্রান্তের বনের ভিতর থেকেও বেরিয়ে আসছে কাতারে কাতারে আরো সৈন্য!"

শশীগুপ্ত তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়ার উপরে চ'ড়ে বললে "বসুমিত্র! অগ্রবর্তী-দল আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে! ওরা ভেরী বাজিয়ে

আমাদের থামতে বলছে। কিন্তু দেখছ, ওদের পতাকায় কি আঁকা রয়েছে?”

বসুমিত্র বললে, “পতাকায় আঁকা রয়েছে, ময়ূর!”

—“হাঁ, মৌর্যবংশের নিদর্শন! বসুমিত্র, ওরা মগধের সৈন্য,—আমাদের শত্রু! সংখ্যায় ওরা দেখছি অগণ্য। এখন আমাদের পক্ষে এ-স্থান ত্যাগ করাই উচিত।...সৈন্যগণ, পশ্চিম দিকে ঘোড়া ছোটাও।”

সুবন্ধু শূন্যে তরবারি নাচিয়ে হেঁকে বললে, “সে কি শশীগুপ্ত? আমি তো মরতে প্রস্তুত! তোমরা আমাকে বধ করবে না?”

শশীগুপ্ত তার দিকে অগ্নি-উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নিজের ঘোড়া চালিয়ে দিলে পশ্চিম দিকে।

বসুমিত্র এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বললে, “সুবন্ধু, এ-যাত্রাও তুই বেঁচে গেলি।”

সুবন্ধু হা-হা ক'রে অট্টহাসি হেসে বললে, “মরতে আমি ভালোবাসি, আমি তো মরতে ভয় পাই না তোদের মতো! ওরে ভারতের কুসন্তান, ওরে বিশ্বাসঘাতকের দল! স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিতেও যে কত আনন্দ, সে কথা তোরা বুঝবি কেমন ক'রে?”

কিন্তু তার কথা তারা কেউ শুনতে পেলে না, কারণ তখন তাদের ঘোড়া ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

—“হাঁ সুবন্ধু, ঠিক বলেছ! স্বদেশের জন্যে প্রাণ দেওয়ার মতন আনন্দ আর নেই!”

শত শত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল সুবন্ধুর কাণের কাছে। চমকে সে ফিরে দেখলে, তার সামনেই তেজীয়ান এক অশ্বের পৃষ্ঠদেশে ব'সে আছেন সহাস্যমুখে চন্দ্রগুপ্ত!

সুবন্ধু সবিস্ময়ে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েই, ভূতলে জানু পেতে ব'সে বিস্মিত স্বরে বললে, “মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর!”

প্রথম যৌবনের নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গিতে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে নীচে নেমে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "রাজবংশে জন্ম বটে, কিন্তু এখনো মহারাজা হ'তে পারি নি, সুবন্ধু।"

প্রথম সম্ভাষণের পালা শেষ হ'লে পর সুবন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "কিন্তু মহারাজ, কোথা থেকে দেবদূতের মতন অকস্মাৎ আপনি এখানে এলেন? আপনার সঙ্গে এত সৈন্যই বা কেন? আপনি কি মগধের সিংহাসন অধিকার করেছেন?"

চন্দ্রগুপ্ত দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না সুবন্ধু, মগধের সিংহাসনে বসবার যোগ্যতা এখনো আমার হয় নি। ধন-নন্দের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি পরাজিত হয়েছি।"

—"হা ভগবান, আমি যে আপনার উপরে অনেক আশা করেছিলুম!"

—"আশা করেছিলে?"

—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! আমি যে মহারাজা পুরুর প্রতিনিধি রূপে বিজয়ী মহারাজা চন্দ্রগুপ্তকে আহ্বান করবার জন্যে মগধে যাত্রা করেছিলুম! পথের মধ্যে আমাকে বন্দী বা বধ করবার জন্যে এসেছিল শশীগুপ্ত—"

—"তারপর আমাদের দেখে তারা শেয়ালের মতন পালিয়ে গেল? কেমন, এই তো? বুঝেছি। কিন্তু আশ্বস্ত হও সুবন্ধু, একবার পরাজিত হ'লেও আমি হতাশ হই নি! বিশাল মগধ-সাম্রাজ্য একদিনে জয় করা যায় না। মগধের সিংহাসন অধিকার করবার জন্যেই আমি যাচ্ছি সীমান্তের দিকে!"

সুবন্ধু বিস্মিত ভাবে চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললে, "মহারাজ, ক্ষমা করবেন। আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। সীমান্তের দিকে যতই অগ্রসর হবেন মগধের সিংহাসন থেকে তো ততই দূরে গিয়ে পড়বেন!"

মৃদু হাস্যে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত ক'রে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "ঠিক কথা। গুরু বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) একটি চমৎকার উপমা দিয়ে আমার প্রথম বিফলতার কারণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিশুর সামনে এক থালা গরম ভাত ধ'রে দাও। শিশু বোকার মতো গরম ভাতের মাঝখানে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু সে যদি বুদ্ধিমানের মতো ধার থেকে ধীরে ধীরে ভাত ভাঙতে সুরু করে, তাহ'লে তার হাত পুড়বে না। তাই গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমি স্থির করেছি, সীমান্ত থেকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে করতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো পাটলিপুত্রের দিকে। আমি নির্বোধ, তাই প্রথমেই রাজধানী আক্রমণ করতে গিয়ে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলুম।"

সুবন্ধু উৎফুল্ল কণ্ঠে ব'লে উঠল, "মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক! মহাপুরুষ বিষ্ণুগুপ্ত ঠিক পরামর্শ দিয়েছেন! তাহ'লে প্রথমেই আপনি কোথায় যাবেন স্থির করেছেন?"

—"পঞ্চনদের দেশে সব-চেয়ে শক্তিশালী পুরুষ হচ্ছেন মহারাজা পুরু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একবার পরাজিত হ'লেও মহারাজা পুরু স্বাধীন হবার সুযোগ কখনো ত্যাগ করবেন না। আমি প্রথমেই তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবো।"

—"আপনি প্রার্থনা করবেন কি, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যেই তো মহারাজা পুরু আমাকে মগধে যেতে আদেশ দিয়েছেন! মহারাজের বিশ্বাস, মগধের রাজা এখন আপনি।"

—"তবেই তো সুবন্ধু, তুমি যে আমায় সমস্যায় ফেললে! মহারাজা পুরু যখন শুনবেন, যুদ্ধে আমি পরাজিত, তখন আর কি আমার সঙ্গে যোগ দিতে ভরসা করবেন?"

সুবন্ধু উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠল, "ভরসা করবেন না? তাহ'লে আপনি চেনেন না মহারাজ পুরুকে! সিংহ কবে শৃঙ্খলে

বন্দী হ'তে চায়? আলেকজাণ্ডার আমাদের মহারাজকে বিশ্বাস করেন না। তিনি ভালো ক'রেই জানেন, পুরুষ-সিংহ পুরুর তরবারি গ্রীকদের রক্তপাত করবার আগ্রহে অধীর হয়ে আছে! তাই নিহত নিকানরের জায়গায় তিনি সেনাপতি ফিলিপকে নিযুক্ত ক'রে আদেশ দিয়েছেন যে, মহারাজা পুরুর উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে। গ্রীকদের দাসত্ব করা মহারাজার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু তিনি একা কি করতে পারেন? উত্তর-ভারত ছেয়ে গেছে গ্রীকে গ্রীকে। ভারতের সোনার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করবার জন্যে নিত্য নূতন গ্রীক এসে এখানে বাসা বাঁধছে! তারা খেলার পুতুলের মতন নাচাচ্ছে তক্ষশীলা আর অভিসারের রাজাকে। তাঁরা যবনদের সেবা ক'রেই খুসি হয়ে আছেন! কিন্তু উত্তর-ভারতের অন্যান্য ছোট ছোট রাজারা বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত—কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তবে এ বিদ্রোহ সফল হবে না, যদি কোনো নেতা এসে সবাইকে একতার বাঁধনে বাঁধতে না পারে।"

চন্দ্রগুপ্ত আচম্বিতে তাঁর অসি কোষমুক্ত ক'রে ঊর্ধ্বে তুলে পরিপূর্ণ স্বরে বললেন, "তাহ'লে নেতার পদ গ্রহণ করবো আমি সুবন্ধু, আমি নিজেই! আলেকজাণ্ডারকে আমি দেখাতে চাই, ভীমার্জুনের স্বদেশে আজও বীরের অভাব হয় নি!"

সুবন্ধু বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বললে, "জানি মহারাজ, ভারতে আপনার মতো দু-চারজন বীরের তরবারিতে এখনো মর্চে পড়েনি! কিন্তু দু'চারজনের তরবারি কি ভারতের শৃঙ্খল ভাঙতে পারবে?"

চন্দ্রগুপ্ত প্রান্তরের পূর্বদিকে অসি খেলিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "দু-চারজন বীর নন সুবন্ধু, ওদিকে দৃষ্টিপাত করো! আমি পরাজিত বটে, কিন্তু আজ আর সম্বলহীন নই! চেয়ে দেখো, আমি কত বীর নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করতে চলেছি!"

এতক্ষণ সুবন্ধু ওদিকে তাকাবার অবসর পায় নি। এখন ফিরে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, কুরুক্ষেত্রের বিপুল প্রান্তরের পূর্বপ্রান্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে অগণ্য সৈন্যে সৈন্যে! হাজার হাজার সৈন্য প্রান্তরের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং আরো হাজার হাজার সৈন্য এখনো অরণ্যের ভিতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে—যেন তাদের শেষ নেই!

চন্দ্রগুপ্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমাদের সঙ্গে যদি যোগ দেয় মহারাজা পুরুর সৈন্যদল, তাহ'লে কি আমরা ভারতকে আবার স্বাধীন করতে পারবো না?"

সুবন্ধু জানু পেতে আবার চন্দ্রগুপ্তের পদতলে ব'সে প'ড়ে অভিভূত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল, "জয়, স্বাধীন ভারতের জয়! জয়, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়!"

তার দুই চোখ ভ'রে গেল বিপুল আনন্দের অশ্রুজলে!

দশম পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যুফাঁদ

মহাভারতের রক্তে রাঙা কুরুক্ষেত্র! ভীষ্ম-দ্রোণের ধনুকের টঙ্কার, যুধিষ্ঠিরের শান্ত বাণী, ভীমার্জ্জনের সিংহনাদ, দুর্যোধনের হুঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণের চালিত যুদ্ধরথের ঘর্ঘর-ধ্বনি, গান্ধারী সুভদ্রা ও উত্তরার পাথর-গলানো করুণ আর্তনাদ কত কাল আগে স্তব্ধ হয়েছে, এ বিপুল প্রান্তর কতকাল ধ'রে জনশূন্য স্মৃতির মরুভূমির মতো পড়েছিল!

আজ আবার সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মুক্ত জনতার কলকণ্ঠ! একদিন এই কুরুক্ষেত্রে গিয়ে গৃহবিবাদে মত্ত হয়ে মহা মহা বীররা করেছিলেন স্বেচ্ছায় ভারতের ক্ষাত্র-বীর্যের সমাধি রচনা, কিন্তু আজ সেই সমাধির মধ্যেই আবার জাগ্রত হয়েছে ভারতের চির-পুরাতন কিন্তু চির-নূতন আত্মা, হিন্দুস্থানকে যবনের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে।

শিবিরের পর শিবিরের সারি, প্রত্যেক শিবিরের উপরে উড়ছে রক্তপতাকার পর রক্তপতাকা! শত শত রথ, অসংখ্য হস্তী, দলে দলে অশ্ব! কোথাও চলেছে রণ-বাদ্যের মহলা, কোথাও হচ্ছে অস্ত্রক্রীড়া এবং কোথাও বসেছে গল্পগুজব বা পরামর্শের সভা!

এই প্রকাণ্ড শিবির-নগরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে মস্ত বড় এক তাঁবু—তাকে তাঁবু না ব'লে কাপড়ে-তৈরি প্রাসাদ বললেই ঠিক হয়! তার উপরে উড়ছে ময়ুর-আঁকা বৃহৎ এক পতাকা, মৌর্য রাজবংশের নিজস্ব নিদর্শন!

সেই বিচিত্র শিবির-প্রাসাদের সবচেয়ে বড় কক্ষে আজ রাজসভার বিশেষ এক অধিবেশন। দ্বারে দ্বারে সতর্ক প্রহরীরা তরবারি বা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীবন্ত মূর্তির মতো। শতাধিক সভাসদ

যথাযোগ্য আসনে নীরবে ব'সে আছেন। মাঝখানে উচ্চাসনে উপবিষ্ট চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পাশে আর একটি উচ্চাসন, কিন্তু শূন্য।

হঠাৎ প্রধান প্রবেশ-পথ থেকে প্রহরীরা সসম্ভ্রমে দুই পাশে স'রে গেল এবং সভার মধ্যে ধীরচরণে গম্ভীর মুখে প্রবেশ করলেন এক শীর্ণদেহ গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ! তাঁরমুণ্ডিত মস্তক, উন্নত প্রশস্ত ললাট, দুই চক্ষু বিদ্যুত-বর্ষী, গোঁফ-দাড়ী কামানো, ওষ্ঠাধর দৃঢ়-সংবদ্ধ, পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়, পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকা। তাঁর ভাব-ভঙ্গি এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় যে, তাঁকে দেখলেই মাথা যেন আপনি নত হয়ে পড়ে। ইনিই হচ্ছেন ভারতের চিরস্মরণীয় চাণক্য (কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত)!

সভাস্থ সকলেই ভূমিতলে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন। হাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ ক'রে চাণক্য অগ্রসর হয়ে চন্দ্রগুপ্তের পাশের আসনে গিয়ে বসলেন।

একবার সভার চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে চাণক্য বললেন, "চন্দ্রগুপ্ত, তুমি আজ আমায় আবার সভায় আহ্বান করেছ কেন?"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "গুরুদেব, আজ একমাস ধ'রে আমরা অলস হয়ে এখানে ব'সে আছি!"

চাণক্যের দুই ভুরু সঙ্কুচিত হ'ল। কিন্তু তিনি শান্ত স্বরেই বললেন, "জানি চন্দ্রগুপ্ত। একমাস কেন, দরকার হ'লে আমাদের দুই মাস ধ'রে এইখানেই ব'সে থাকতে হবে। সুবন্ধু এখনো পুরুর কাছ থেকে ফিরে আসেনি!"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "কিন্তু সুবন্ধু যখন এতদিনেও ফিরল না, তখন আমার সন্দেহ হচ্ছে যে মহারাজা পুরু নিজের মত পরিবর্তন করেছেন!

চাণক্য গম্ভীর স্বরে বললেন, "না! তাহ'লেও সুবন্ধু এতদিনে ফিরে এসে আমাদের সে-খবর দিত। আমার বিশ্বাস, মহারাজা পুরু ভালো ক'রে প্রস্তুত হচ্ছেন ব'লেই সুবন্ধু এখনো অপেক্ষা করছে। পুরুর চারিদিকেই সতর্ক গ্রীকদের পাহারা, তার মধ্যে

গোপনে প্রস্তুত হ'তে গেলে যথেষ্ট সময়ের দরকার। পুরু যতদিন না বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ততদিন—"

চাণক্যের কথা শেষ হবার আগেই সভার দ্বারপথের কাছে একটা গোলমাল উঠল। তারপরেই দেখা গেল, দুই হাতে প্রহরীদের ঠেলে সভার ভিতর ছুটে এল ধূলি-ধূসরিত দেহে সুবন্ধু!

চন্দ্রগুপ্ত ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, "এই যে সুবন্ধু!"

সুবন্ধু চীৎকার ক'রে বললে "মহারাজ! বিশ-হাজার গ্রীক সৈন্য আর ত্রিশ-হাজার ভারতীয় সৈন্য নিয়ে শশীগুপ্ত আপনাকে আক্রমণ করতে আসছে! প্রস্তুত হোন, শীঘ্র প্রস্তুত হোন!"

চন্দ্রগুপ্ত সচকিত ভাবে আসন থেকে নেমে পড়লেন, সভাসদরা সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়ালেন—অটল মূর্তির মতো নিজের আসনে ব'সে রইলেন কেবল চাণক্য।

চন্দ্রগুপ্ত উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, "সেনাপতি!"

সেনাপতি এগিয়ে এসে অভিবাদন ক'রে বললেন, "আদেশ দিন মহারাজ!"

—"এখনি তূর্যধ্বনি ক'রে—"

চাণক্য বাধা দিয়ে তেমনি শান্ত স্বরেই বললেন, "একটু অপেক্ষা করো চন্দ্রগুপ্ত, অতটা ব্যস্ত হোয়ো,না। সুবন্ধু, মহারাজা পুরুর "খবর কি?"

সুবন্ধু উৎফুল্ল স্বরে বললে, "আচার্য, মহারাজা পুরু বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তাঁর রাজধানী থেকে গ্রীকরা বিতাড়িত হয়েছে। মহারাজা নিজে সসৈন্যে আপনাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে দ্রুত-গতিতে এগিয়ে আসছেন—আমি তাঁরই অগ্রদূত!"

চাণক্য বললেন, "শশীগুপ্ত এ সংবাদ জানে?"

—"মহারাজের বিদ্রোহের খবর পেয়েই চতুর শশীগুপ্তও গ্রীকদের নিয়ে আপনাদের আক্রমণ করতে আসছে!"

চাণক্য অল্পক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, "বুঝেছি। শশীগুপ্ত চায় আলেকজাণ্ডারের পদ্ধতি অবলম্বন করতে। অর্থাৎ সে আগে আমাদের ধ্বংশ করবে, তারপর অক্রমণ করবে মহারাজা পুরুকে।"

চন্দ্রগুপ্ত অধীর স্বরে বললেন, "আদেশ দিন গুরুদেব, আমরা সজ্জিত হই।"

সে কথা কাণে না তুলে চাণক্য বললেন, "আচ্ছা সুবন্ধু, শশীগুপ্ত বোধহয় এখনো জানতে পারে নি যে, মহারাজা পুরুও এইদিকে আসছেন ?"

—"না আচার্য, শশীগুপ্ত এপথে যাত্রা করবার দুদিন পরে আমাদের মহারাজা রাজধানী থেকে বেরিয়েছেন, সুতরাং মহারাজা আসবার আগেই শশীগুপ্ত এখানে এসে পড়বে।"

—"শশীগুপ্ত এখন কত দূরে আছে ?"

—"তাদের আর আমাদের মাঝখানে আছে মাত্র একদিনের পথ।"

—"তাহ'লে চন্দ্রগুপ্ত, কালকেই তোমার সঙ্গে শশীগুপ্তের দেখা হবে।,,

চন্দ্রগুপ্ত দৃঢ় স্বরে বললেন, "আদেশ দিন গুরুদেব, আমরাই এগিয়ে গিয়ে শশীগুপ্তকে আক্রমণ করি। সেনাপতি—"

চাণক্য ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "চন্দ্রগুপ্ত, বালকের মতো ব্যস্ত হয়ো না! এই ব্যস্ততার জন্যই তুমি একবার মগধ আক্রমণ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছ, কিন্তু এবারের সুযোগ ত্যাগ করলে আর কোনদিন তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না!"

চন্দ্রগুপ্ত কুণ্ঠীত স্বরে বললেন, "গুরুদেব, এ সুযোগ, না দুর্যোগ ?"

—"সুযোগ চন্দ্রগুপ্ত, দুর্লভ সুযোগ! মহা-ভাগ্যবানের জীবনেও এমন সুযোগ একবার-মাত্রই আসে।"

—"ক্ষমা করবেন গুরুদেব, আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে

পারছি না! আমার অধীনে সৈন্য আছে মোটে পঁয়ত্রিশ হাজার, আর শশীগুপ্ত আক্রমণ করতে আসছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে। এটা কি বিপদের কথা নয়?"

চাণক্য সস্নেহে চন্দ্রগুপ্তের মাথায় হাত রেখে বললেন, "বৎস, আশ্বস্ত হও। চিন্তার কোনই কারণ নেই। সুবন্ধু, মহারাজা পুরুর অধীনে কত সৈন্য আছে?"

—"গ্রীকদের অধীনতা স্বীকার করবার পর মহারাজা পুরুর রাজ্য আর লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি এখন আশী-হাজার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে পারেন।"

—"তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন কত সৈন্য নিয়ে?"

—"চল্লিশ-হাজার।"

—"শুনছ চন্দ্রগুপ্ত?"

কিছুমাত্র উৎসাহিত না হয়ে চন্দ্রগুপ্ত বললেন, "শুনে কি লাভ গুরুদেব? মহারাজা হস্তীর সঙ্গেও মহারাজা পুরু যদি মিলতে পারতেন, তাহ'লে আজ ভারতের মাটিতে গ্রীকদের পদচিহ্ন পড়ত না। এবারেও মহারাজা পুরু আসবার আগেই অসংখ্য শত্রুর চাপে আমরা মারা পড়বো। সেইজন্যেই আমি এগিয়ে গিয়ে ব্যূহ রচনা করবার আগেই শত্রুদের আক্রমণ করতে চাই। কিন্তু দেখছি, আপনার ইচ্ছা অন্য রকম।"

চাণক্য আবার সুবন্ধুর দিকে ফিরে বললেন, "মহারাজ পুরু শশীগুপ্তের গতিবিধির খবর রাখেন তো?"

—"সেই খবর পেয়েই তো তিনি শশীগুপ্তের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে আসছেন!"

চাণক্যের দুই চক্ষে আগুন জ্ব'লে উঠল! এতক্ষণ পরে আসন ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়ে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, "চন্দ্রগুপ্ত! এই

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমি বিশ-হাজার গ্রীক দস্যু আর ত্রিশ-হাজার বিশ্বাসঘাতক ভারতবাসীর মৃত্যু-শয্যা রচনা করবো,—আর তাদের রক্ষা নেই !"

—"গুরুদেব !"

—"যাও চন্দ্রগুপ্ত, সৈন্যদের সজ্জিত হবার জন্যে আদেশ দাও। অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা ক'রে উচ্চভূমির উপরে শত্রুদের জন্যে অপেক্ষা করো !"

—"অপেক্ষা করবো ?"

—"হাঁ, আক্রমণ করবে না, অপেক্ষা করবে। পথশ্রমে ক্লান্ত শত্রুরা কাল এসে দেখবে, তোমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ! সে-অবস্থায় কাল তারা নিশ্চয়ই আক্রমণ করতে সাহস করবে না। তারা আগে বিশ্রাম আর ব্যূহ রচনা করবে। পরশুর আগে যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব !"

—"তারপর ?"

—"তারপর তাদেরই আগে আক্রমণ করবার সুযোগ দিও, তোমরা করবে কেবল আত্মরক্ষা ! শত প্রলোভনেও উচ্চভূমি ছেড়ে নীচে নামবে না। যদি একদিন কাটিয়ে দিতে পারো—"

হঠাৎ চন্দ্রগুপ্তের মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল ! তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাণক্যের চরণতলে ব'সে প'ড়ে বিপুল আনন্দে তিনি বললেন, "গুরুদেব, গুরুদেব ! আমি মূর্খ, তাই এতক্ষণ আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি ! পরশু দিন যদি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি, তাহ'লেই তার পরদিন মহারাজা পুরু এসে প'ড়ে পিছন থেকে শত্রুদের আক্রমণ করবেন ! তারপর পঁচাত্তরহাজার ভারত সৈন্যের কবলে প'ড়ে—"

সুবন্ধু আনন্দে যেন নাচতে নাচতে ব'লে উঠল, "ধন্য আচার্য্যদেব, ধন্য ! এ যে অপূর্ব মৃত্যু-ফাঁদ !"

চন্দ্রগুপ্তের নত মাথার উপরে তুই হাত রেখে চাণক্য অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে চন্দ্রগুপ্ত! বৎস, সেই দিনের কথা মনে করো! তোমার পিতা যুদ্ধে মৃত, তোমার বিধবা মাতা :কুসুমপুরে (পাটলিপুত্রে) নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। গরিবের ছেলের মতো পথে পথে তুমি খেলা ক'রে বেড়াচ্ছিলে, সেই সময়ে তোমার সঙ্গে আমার দেখা। তোমার ললাটে রাজচিহ্ন আর তোমার মুখে প্রতিভার জ্যোতি দেখে তোমার পালক-পিতার কাছ থেকে তোমাকে আমি ক্রয় করি। তারপর জন্মভূমি তক্ষশীলায় নিয়ে এসে তোমাকে আমি নিজের মনের মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিই। মৌর্য রাজপুত্র! এইবার তোমার গুরু-দক্ষিণা দেবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে! আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা! আমি চাই অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য! আমি চাই হিন্দু ভারতবর্ষ! আসন্ন যুদ্ধে তোমার জয় সুনিশ্চিত! এই একটিমাত্র যুদ্ধজয়ের ফলে সারা ভারতবর্ষে আর কেউ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে সাহস করবে না, তোমার সামনে খুলে যাবে মগধের তুর্গ-দ্বার। ওঠো বৎস, অস্ত্রধারণ করো!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ!

মৃত্যু-উৎসবে আজ বাজছে ভেরী, বাজছে তুরী, বাজছে শিঙা, বাজছে কত শঙ্খ! রণোন্মত্ত অশ্বদলের হ্রেষা, মদমত্ত হস্তীযূথের বৃংহিত এবং সেইসঙ্গে মহা ঘর্ঘর রব তুলে ও রক্তসিক্ত রাঙা কর্দমে দীর্ঘ রেখা টেনে বেগে ছুটছে যুদ্ধরথের পর যুদ্ধরথ! নীলাকাশের বুকে মূর্তিমান অমঙ্গলের ইঙ্গিতের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি উড়তে উড়তে পৃথিবীর দিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখছে, কুরুক্ষেত্রের ধূ-ধূ-ধূ প্রান্তর জুড়ে সূর্যকরের বিদ্যুৎ সৃষ্টি করছে হাজার হাজার শাণিত তরবারি, ভল্ল, কুঠার, খড়্গ, ও লক্ষ লক্ষ তীরের ফলা! থর-থর কাঁপছে ধরণীর প্রাণ প্রায় লক্ষ যোদ্ধার প্রচণ্ড পদ-ভারে! ধনুক-টঙ্কারের তালে তালে জাগছে খড়্গে-খড়্গে চুম্বন-রব, বীরের হুঙ্কার, সাহসীর জয়ধ্বনি, ক্রুদ্ধের চীৎকার, সেনাধ্যক্ষদের উচ্চ আদেশ-বাণী, আহতের আর্তনাদ, কাপুরুষের ক্রন্দন! সেই দুই বিপুল বাহিনীর কোনো অংশ সামনে এগিয়ে আসছে, কোনো অংশ যাচ্ছে পিছিয়ে, কোনো অংশ ফিরছে বামদিকে কোনো অংশ ফিরছে ডানদিকে, —অনন্ত জনতা সাগরে যেন তরঙ্গের দল উচ্ছ্বসিত আবেগে জেগে উঠছে ও ভেঙে পড়ছে!

সেদিনের যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের কিছুই মেলে না। আজকের যুদ্ধ হচ্ছে যন্ত্রের যুদ্ধ এবং যন্ত্র মানুষের ব্যক্তিগত বীরত্বকে ধর্তব্যেরই মধ্যে গণ্য করে না! আজকের সৈন্যেরা লড়াই করে

যেন বাতাসের সঙ্গে! নানা যন্ত্র কর্ণভেদী নানা কোলাহল তুলে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মানুষের দৃষ্টি দিলে অন্ধ ক'রে,—প্রতিদ্বন্দ্বিরা কেউ কারুকে চোখেও দেখলে না, কিন্তু আহত ও হত দেহের রক্তে

রণস্থল গেল আচ্ছন্ন হয়ে এবং যুদ্ধ হ'ল শেষ! মানুষের বীরত্বের উপরে স্থান পেয়েছে আজ যন্ত্রের শক্তি। যে পক্ষের যন্ত্র দুর্বল, হাজার হাজার মহাবীর আত্মদান ক'রেও বাঁচাতে পারবে না সে-পক্ষকে।

নিজের পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে উচ্চভূমির উপরে চন্দ্রগুপ্ত যে অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করেছিলেন, আজ প্রায় সারাদিন ধ'রে অর্ধলক্ষ ভারতের শত্রু তা ভেদ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে! ব্যূহের সামনে হাজার হাজার মৃতদেহের উপরে মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে,—সেখানে শত্রু-মিত্র একাকার হয়ে গিয়ে সৃষ্ট হয়েছে যেন মৃত নরদেহ দিয়ে গড়া অপূর্ব ও ভীষণ এক দুর্গ-প্রাচীর!

গ্রীক-সেনাপতি ও শশীগুপ্ত পাশাপাশি দুই ঘোড়ার উপরে ব'সে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষন করছিলেন।

গ্রীক-সেনাপতি উর্ধ্বদিকে তাকিয়ে দেখলেন, সূর্য জ্বলছে পশ্চিম আকাশে।

শশীগুপ্তকে নিজের ভাষায় ডেকে তিনি বললেন, "সিসিকোটাস্! বেলা প'ড়ে এল। যুদ্ধ আজ বোধহয় শেষ হবে না।"

শশীগুপ্ত বললেন, "সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক কম ব'লে শত্রুরা প্রতি আক্রমণ না ক'রে কেবল আত্মরক্ষাই করছে। ওরা উঁচু জমির উপরে না থাকলে এতক্ষণে যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যেত।"

সেনাপতি দৃঢ় স্বরে বললেন, "কিন্তু এ যুদ্ধ আজকেই শেষ করতে চাই।"

—"কি ক'রে" সেনাপতি?"

—"আমাদের ডানপাশে আর বাঁ-পাশে যত গজারোহী অশ্বারোহী আর রথারোহী সৈন্য আছে, সবাইকে মাঝখানে এনে এইবারে আমরা শত্রু-ব্যূহের মধ্যভাগ আক্রমণ করবো।"

—"কিন্তু সেনাপতি, তাহ'লে আমাদের দুই পাশ যে দুর্বল হয়ে পড়বে!"

—"পড়ুক। বীর গ্রীকদের কাপুরুষ ভারতবাসীরা ভয় করে। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি আক্রমণ করবে না।"

উচ্চভূমির উপরে হাতীর পিঠে চাণক্য স্থির হয়ে বসেছিলেন পাথরের মূর্তির মতো। তাঁর মুখও স্থির মুখোসের মতো, মনের কোনো ভাবই তা প্রকাশ করে না।

হঠাৎ সুবন্ধু বেগে ঘোড়া চালিয়ে চাণক্যের হাতীর পাশে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "গুরুদেব! গুরুদেব!"

—"বৎস?"

—"শত্রুদের সমস্ত গজারোহী আর অশ্বারোহী রথারোহী সৈন্য মাঝখানে এসে আমাদের আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছে।"

—"সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি!"

—"শত্রুদের ব্যূহের দুইপাশ এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন যদি আমাদের রথ, গজ আর অশ্ব শত্রুদের ব্যূহের দুই পাশ আক্রমণ করে, তাহ'লে—"

বাধা দিয়ে চাণক্য বললেন, "তাহ'লে আমাদের সুবিধা হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে। সংখ্যায় আমরা কম—শত্রুদের ঘিরে ফেলবার বা সহজে কাবু করবার শক্তি আমাদের নেই। এ সময়ে আমাদের ব্যূহ বিশৃঙ্খল হ'লে ফল ভালো হবে না। আমরা কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষাই করবো।"

—"তবে কি শত্রুদের ঠেকাবার জন্যে আমরাও সমস্ত রথ, গজ আর অশ্বকে মাঝখানে এনে হাজির করবো?"

চাণক্যের ওষ্ঠাধরে ফুটল অল্প-হাসির আভাস! বললেন, "সুবন্ধু, তুমি বীর বটে, কিন্তু যুদ্ধ-রীতিতে নিতান্ত কাঁচা! তোমার কথামতো কাজ করলে আমাদেরও দুই পাশ দুর্বল হয়ে পড়বে আর সংখ্যায় বলিষ্ঠ শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলবে চারিদিক থেকে!"

—"কিন্তু গুরুদেব, শত্রুদের অত রথ, গজ আর অশ্ব যদি

আমাদের ব্যূহের মাঝখানে একত্রে আক্রমণ করে, তাহ'লে আর কি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো ?”

—“পারবো সুবন্ধু, পারবো,—অন্তত আজকের জন্যে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো। ঐ শোনো, রণকুশল চন্দ্রগুপ্তের শঙ্খ-সঙ্কেত !.........ঐ দেখো, আমাদের যে পাঁচ-হাজার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈন্য এতক্ষণ যুদ্ধে যোগ না দিয়ে পিছনে অপেক্ষা করছিল, এইবার তারাও ব্যূহের মধ্যভাগ রক্ষা করতে এগিয়ে, আসছে ! আরো দেখো, চন্দ্রগুপ্তের আদেশে আমাদের ধনুকধারী সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই মাঝখানে এসে প্রস্তুত হয়েছে ! সাধু চন্দ্রগুপ্ত, সাধু ! তুমি মিথ্যা আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করনি !”

তবু সুবন্ধুর সন্দেহ ঘুচল না। দ্বিধাভরে সে বললে,“কিন্তু—”

—“মূর্খ, এর মধ্যে আর কোনো ‘কিন্তু’ নেই ! আমরা আছি উচ্চভূমির উপরে। শত্রুদের রথ, গজ আর অশ্ব এর উপরে দ্রুতগতিতে উঠতে পারবে না। আমাদের ধনুকধারীরা সহজেই দূর থেকে তাদের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখতে পারবে। তীর এড়িয়ে যারা কাছে এসে পড়বে, তাদের বাধা দেবে আমাদের নূতন, অক্লান্ত, শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল।...সুবন্ধু, আকাশের দিকে চেয়ে দেখো! বেলা আছে আর অর্ধ-প্রহর মাত্র ! এই সময়টুকু কাটিয়ে দিতে পারলেই সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যাবে—আমরাও সময় পাবো আরো একরাত্রি ! তারপর ভরসা তোমাদের রাজা পর্বতক !”*

গ্রীক-সেনাপতি বিরক্ত মুখে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে দেখছিলেন, সাগর-শৈলের তলদেশে গিয়ে অনন্ত সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গদল যেমন বিষম

* একাধিক সংস্কৃত বিবরণীতে প্রকাশ, রাজা পর্বতকের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বৌদ্ধ বিবরণীতেও ঐ-রকম কথা আছে। Cambridge History of India র মতে গ্রীকদের ‘পুরু’ই হচ্ছেন ‘পর্বতক’। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও এই মত গ্রহণ করেছেন।—লেখক।

আবেগে ভেঙে পড়ে আবার ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে বারংবার, তাঁর গজারোহী রথারোহী ও অশ্বারোহীর দল তেমনি ভাবেই উচ্চভূমির উপরে উঠতে গিয়ে প্রতি বারেই মারাত্মক বাধা পেয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে! সারথি, যোদ্ধা ও অশ্বহীন কত রথ নিশ্চল হয়ে গ্রীক সৈন্যদলের সামনে বাধা সৃষ্টি করছে, হিন্দুদের অব্যর্থ তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কত হস্তী পাগলের মতো পালিয়ে এসে স্বপক্ষেরই মধ্যে ছুটাছুটি ক'রে শত শত গ্রীক সৈন্যকে পায়ের তলায় থেৎলে মেরে ফেলছে! হিন্দু ব্যূহ দুর্ভেদ্য!

পশ্চিম গগনের অস্তাচলগামী সূর্যের পানে তাকিয়ে শশীগুপ্ত হতাশভাবে বললেন, "সেনাপতি, আজ যুদ্ধ শেষ হওয়া অসম্ভব!"

মাথা নেড়ে তিক্ত কণ্ঠে গ্রীক সেনাপতি বললেন, "না সিসিকোটাস্, আজ আমি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চাই! বর্বর ভারত আজও ভালো ক'রে গ্রীক বীরত্বের পরিচয় পায়নি! তুমি এখনি আমার আদেশ চারিদিকে প্রচার ক'রে দাও! আমার ফৌযের ডান পাশ আর বাঁ পাশও একসঙ্গে অগ্রসর হোক্! সর্ব-দিক দিয়ে আক্রমণ করো, শত্রুদের একেবারে ঘিরে ফ্যালো!"

সেনাপতির মুখের কথা শেষ হ'তে না হতেই দেখা গেল, একজন গ্রীক সেনানী ঘোড়ায় চ'ড়ে বেগে কাছে এসে দাঁড়াল।

সেনাপতি বললেন, "কি আরিষ্টোন্‌টেস্? তোমার মুখ মাছের তলপেটের মতো সাদা কেন? তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভয়ানক ভয় পেয়েছ! গ্রীক সেনানীর চোখে ভয়! ব্যাপার কি?"

সেনানী চীৎকার ক'রে বললে, "নতুন শত্রু! নতুন শত্রু!"

সেনাপতি কর্কশ স্বরে বললেন, "আরিষ্টোন্‌টেস্, আমি অন্ধ নই! হিন্দু বর্বররা যে নতুন সৈন্যদল নিয়ে আমাদের বাধা দিচ্ছে, সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি!"

সেনানী আবার চীৎকার ক'রে বললে, "ওদিকে নয়—ওদিকে নয়! আমাদের পিছন দিকে তাকিয়ে দেখুন!"

সচমকে ঘোড়া ফিরিয়ে সেনাপতি মহা বিস্ময়ে দেখলেন, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যেখানে গ্রীক সৈন্যরেখা শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরো খানিক দূরে আত্মপ্রকাশ করেছে, মস্ত একদল পল্টন! দেখতে দেখতে প্রান্তরের শূন্যতা অধিকতর পূর্ণ হয়ে উঠছে এবং সেই বিপুল বাহিনীর আকার হয়ে উঠছে বৃহত্তর! সেই বহুদূরব্যাপী সৈন্য-স্রোতের যেন শেষ নেই!

রুদ্ধশ্বাসে সেনাপতি বললেন, "সিসিকোটাস্, ওরা কারা?—শত্রু না মিত্র?"

শশীগুপ্ত স্তম্ভিত কণ্ঠে বলিলেন, "সেনাপতি ওরা আমাদের মিত্র নয়! দেখছেন না, ওদের মাথার উপরে উড়ছে মহারাজা পুরুর পতাকা?"

দাঁতে দাঁত ঘ'ষে তীব্র স্বরে সেনাপতি বললেন, "বিশ্বাসঘাতক পোরাস্!"

শশীগুপ্ত সভয়ে বললেন, "দেখুন সেনাপতি! আমাদের পিছনের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে সুরু করেছে! আবার এদিকেও দেখুন, চন্দ্রগুপ্তের ব্যূহের দুই পাশ থেকে রথারোহী গজারোহী আর অশ্বারোহীর দলও অগ্রসর হয়ে আমাদের দুই পাশ আক্রমণ করতে আসছে। আমরা ফাঁদে ধরা পড়েছি—আর আমাদের বাঁচোয়া নেই!"

নিষ্ফল আক্রোশে কপালে করাঘাত ক'রে গ্রীক সেনাপতি বললেন, "মূর্খ, আমরা হচ্ছি মূর্খ! এইবারে বুঝলুম, ঐ ভারতীয় বর্বররা কেন এতক্ষণ ধ'রে কেবল আমাদের আক্রমণ সহ্য করছিল। ওরা এতক্ষণ ধ'রে পোরাসেরই অপেক্ষায় ছিল! ওরা জানত পোরাস্ আসছে আমাদের পিছনদিক আক্রমণ করতে! এর জন্যে তুমিই

দায়ী সিসিকোটাস্! কেন তুমি পোরাসের গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে গুপ্তচর নিযুক্ত ক'রে আসোনি?"

শশীগুপ্ত বললেন, "সেনাপতি, আমার গুপ্তচর আছে অসংখ্য! কিন্তু মহারাজা পুরু যদি তাদেরও চেয়ে চতুর ও দ্রুতগামী হন, তাহ'লে আমি কি করতে পারি বলুন?"

সেনানী আরিষ্টোনটেস্ ব্যাকুল স্বরে বললে, "সেনাপতি, আমাদের সামনের সৈন্যরাও পালিয়ে যাচ্ছে যে!"

সেনাপতি শূন্যে তরবারি তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও গ্রীক সৈন্যগণ! শৃগালের ভয়ে সিংহ কোনদিন পালিয়ে যায় না! ভুলে যেওনা, তোমরা গ্রীক! যদি মরতে হয়, গ্রীকদের মতন লড়তে লড়তেই প্রাণ দাও!"

শশীগুপ্ত বললেন, "কেউ আর আপনার কথা শুনবে না সেনাপতি, বৃথাই চীৎকার করছেন! আসুন, আমরাও রণক্ষেত্র ত্যাগ করি।"

ভীষণ গর্জন ক'রে গ্রীক-সেনাপতি বললেন, "স্তব্ধ হও! আমি তোমার মতন দেশদ্রোহী দুরাত্মা নই, তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গ্রীসের নাম কলঙ্কিত করবো না!"

নীরস হাসি হেসে শশীগুপ্ত বললেন, "তাহ'লে আপনি তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাবার চেষ্টা করুন, কিন্তু আমি আরো কিছুদিন পৃথিবীর সুখ ভোগ করতে চাই"—এই ব'লেই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে অন্যান্য পলাতকদের দলের ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

আর গ্রীক সেনাপতি? তিনি সদর্পে, উন্নত শিরে, অটলভাবে অশ্বচালনা করলেন চন্দ্রগুপ্তের পতাকার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে।

সূর্য তখন নেমে গিয়েছে দিকচক্রবাল-রেখার নীচে। তখনো আকাশ আরক্ত এবং তেমনি আরক্ত কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তর। পলাতক গ্রীকরা এবং তাদের সঙ্গী দেশদ্রোহী ভারতীয় সৈনিকরা

পালিয়েও কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারলে না! এদিক থেকে চন্দ্রগুপ্তের অর্ধচন্দ্র-ব্যূহের মতো, ওদিক থেকেও পুরুর অর্ধচন্দ্র ব্যূহ পরস্পরের দিকে এগিয়ে এল এবং দুই অর্ধচন্দ্রব্যূহের দুইপ্রান্ত যখন মিলিত হয়ে প্রকাণ্ড এক পূর্ণমণ্ডল রচনা করলে, তখন তার মধ্যে যেন বেড়াজালে ধরা পড়ল ভারতের অধিকাংশ শত্রু! তারপরে আরম্ভ হ'ল যে বিরাট হত্যাকাণ্ড, যে বীভৎস বিজয়গর্জন, যে ভয়াবহ মৃত্যু-ক্রন্দন, পৃথিবীর কোনো ভাষাই তা বর্ণনা করতে পারবে না! কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর হয়ে উঠল যেন ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ডের বিপুল ডালা!

বহুকালের বিশুষ্ক কুরুক্ষেত্রের তৃষ্ণার্ত বুক আজ আবার রক্ত-সমুদ্রে অবগাহন করবার সুযোগ পেলে।

পরদিনের জন্যে ভোজসভা প্রস্তুত রইল জেনে আসন্ন অন্ধকারে শকুনির দল বাসার দিকে ফিরে গেল!

মৃত্যু-আহত দিনের ম্লান শেষ-আলোকে মৌর্য রাজবংশের ময়ূর-চিহ্নিত পতাকা বিজয়-পুলকে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

পতাকার তলায় চাণক্যের চরণে নত হয়ে প্রণাম করলেন যুবক চন্দ্রগুপ্ত!

চাণক্য প্রসন্নমুখে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, "বৎস, এ যুদ্ধ চরম যুদ্ধ! নদীর মতো আজ তুমি পাহাড় কেটে বাইরে বেরুলে, এখনো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে বটে, কিন্তু আর কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না। অদূর-ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আজ আমি স্পষ্ট দেখছি, ভারতসাম্রাজ্যের একমাত্র সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজার ঘোড়ার সওয়ার

কিন্তু আনন্দের এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভারত-বন্ধু সুবন্ধুকে কেউ দেখতে পেলে না। রক্তসিক্ত কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর পার হয়ে তার অশ্ব বায়ুবেগে ছুটে চলেছে এক অরণ্য-পথ দিয়ে।

এবং তার খানিক আগে আগে তেমনি বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে আর একজন সওয়ার! দেখলেই বোঝা যায়, সে সুবন্ধুর নাগালের বাইরে যেতে চায়!

কিন্তু সুবন্ধুর ঘোড়া বেশী তেজীয়ান—এ-যে সেই রাজার ঘোড়া! প্রতিমুহূর্তেই সে অগ্রবর্তীর বেশী কাছে এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সুবন্ধু তার ভল্ল তুললে। লক্ষ্য স্থির ক'রে অস্ত্র ত্যাগ করলে এবং সেই তীক্ষ্ণধার ভল্ল প্রবেশ করলে অগ্রবর্তী অশ্বের উদরদেশে।

আরোহীকে নিয়ে অশ্ব হ'ল ভূতলশায়ী। অশ্ব আর উঠল না, কিন্তু আরোহী গাত্রোত্থান ক'রে দেখলে, ঠিক তার সমুখেই ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল সুবন্ধু!

অশ্বহীন আরোহী বললে, "যুদ্ধে আমরা পরাজিত। আমি পলাতক। তবু তুমি আমার অনুসরণ করছ কেন?"

সুবন্ধু হা-হা রবে অট্টহাসি হেসে বললে, "আমি তোমার অনুসরণ করছি কেন? শশীগুপ্ত, সে কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না?"

—"না।"

—"আলেকজাণ্ডারকে তুমিই যে ভারতে পথ দেখিয়ে এনেছিলে এটা তুমি অস্বীকার করবে না তো ?"

—"আমি ছিলুম গ্রীক-সম্রাটের সেনাপতি। প্রভুর আদেশ পালন করতে আমি বাধ্য।"

—"প্রভুর আদেশে তাহ'লে তুমি মাতৃহত্যা করতে পারো ?"

শশীগুপ্ত জবাব দিলেন না।

—"মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত চান গ্রীক-শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে। পাছে মহারাজা পুরুর সাহায্য পেয়ে তিনি অজেয় হয়ে ওঠেন, সেই ভয়ে তুমি গ্রীক সেনাপতিকে নিয়ে আবার স্বদেশের বিরুদ্ধে তরবারি তুলেছিলে।"

—"আমি—"

—"চুপ করো। আগে আমাকে কথা শেষ করতে দাও। যুদ্ধে আজ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হয়েছে। তোমাদের পঞ্চাশ-হাজার সৈন্যের মধ্যে পঁয়ত্রিশ-হাজার সৈন্য শুয়ে আছে কুরুক্ষেত্রের রক্ত-শয্যায়। তাই তুমি আবার ফিরে চলেছ নিজের মুল্লুকে। তুমি আবার সৈন্য সংগ্রহ ক'রে আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করতে চাও। কেমন, এই তো ?"

শশীগুপ্ত ঘৃণাভরে বললেন, "একজন সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে আমি কথা-কাটাকাটি করতে চাই না। পথ ছাড়ো।"

—"পথ ছাড়বো ব'লে তোমার পথ আগ্‌লাই নি। তুমিই হ'চ্ছ ভারতের প্রধান শত্রু। তোমাকে আজ আমি বধ করবো।"

—"তুমি আমাকে হত্যা করবে! জানো, আমি সশস্ত্র ?"

—"আমি হত্যাকারী নই, সম্মুখ-যুদ্ধে আমি তোমাকে বধ করবো! অস্ত্র ধরো,—এই আমি তোমাকে আক্রমণ করলুম!"

মুক্ত তরবারি তুলে সুবন্ধু বাঘের মতন শশীগুপ্তের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

নিজের তরবারি তুলে বাধা দিয়ে শশীগুপ্ত এমন ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি খেলিয়ে তাকে প্রতি-আক্রমণ করলেন যে, সুবন্ধুর বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, তাকে লড়তে হবে এক পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে। সে অধিকতর সাবধান হ'ল।

মিনিট পাঁচেক ধ'রে দুই তরবারির ঝঞ্ঝনা-সঙ্গীতে বনপথ ধ্বনিত হ'তে লাগল। শশীগুপ্তের হস্ত ছিল সমধিক কৌশলী, কিন্তু সুবন্ধুর পক্ষে ছিল নবীন যৌবনের ক্ষিপ্রতা।

যুদ্ধের শেষ ফল কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু এমন সময়ে হঠাৎ এক অদ্ভুত অঘটন ঘটল।

একবার সুবন্ধুর আকস্মিক আক্রমণ এড়াবার জন্যে শশীগুপ্ত এক লাফ পিছিয়ে তাঁর ভূপতিত ঘোড়ার দেহের উপরে গিয়ে পড়লেন।

ঘোড়াটা মরেনি, তখনো মৃত্যু-যন্ত্রণায় প্রবল বেগে চার পা ছুঁড়ে বিষম ছট্‌ফট্ করছিল। তার এক পদাঘাতে শশীগুপ্তের দেহ হ'ল পপাত-ধরণীতলে এবং আর এক প্রচণ্ড পদাঘাতে তাঁর দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ল ছয়-সাত হাত তফাতে।

সুবন্ধু হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু শশীগুপ্তের দেহ নিস্পন্দ হয়ে সমান প'ড়ে রইল দেখে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

সবিস্ময়ে স্তম্ভিত নেত্রে প্রায়-অন্ধকারে মুখ নামিয়ে দেখলে, অশ্বের পদাঘাতে শশীগুপ্তের মাথার খুলি ফেটে হু-হু ক'রে রক্ত বেরুচ্ছে, সে কলঙ্কিত দেহে প্রাণের কোনো চিহ্নই বর্তমান নেই।

অল্পক্ষণ শশীগুপ্তের মৃতদেহের দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে সুবন্ধু ধীরে ধীরে বললে, "শশীগুপ্ত, তোমার আত্মা যদি এখানে হাজির থাকে তাহ'লে শুনে রাখো! তুমি দেশদ্রোহী কাপুরুষ! তোমার অদৃষ্টে বীরের মৃত্যু লেখা নেই! মানুষ হয়েও তুমি পশুজীবন-যাপন করতে, তাই মরলেও আজ পশুর পদাঘাতে আর আজ রাত্রে তোমার দেহেরও সৎকার করবে বনের হিংস্র পশুরা এসে! চমৎকার!"

অরণ্যের সান্ধ্য অন্ধকার ভেদ ক'রে বহুদূর থেকে ভেসে এল মৌর্য শিবিরের উৎসব-কোলাহল! সেই উৎসবে যোগ দেবার জন্যে সুবন্ধু তাড়াতাড়ি রাজার ঘোড়ার পিঠের উপরে চ'ড়ে বসল!

অবশিষ্ট

পঞ্চনদে জাগ্রত ভারত

তারপর ?

তারপর যা হ'ল, আজও ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এর মধ্যে আর গল্প বলবার সুযোগ নেই, তোমাদের শুনতে হবে কেবল ঐতিহাসিক সত্যকথা।

মহারাজা পুরু বা পর্বতককে দলে পেয়ে চন্দ্রগুপ্ত হয়ে উঠলেন একেবারেই অজেয়।

আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করেছিলেন খৃষ্ট-পূর্ব ৩২৭ অব্দে, ভারত ত্যাগ করেছিলেন খৃঃ-পূঃ ৩২৫ অব্দে।

তারই দুই বৎসর পরে—অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ৩২৩ অব্দে ভারতবর্ষের দিকে দিকে র'টে গেল, বাবিলনে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন।

যদিও এ সংবাদ পাবার আগেই পঞ্চনদের তীরে তীরে উড়েছে চন্দ্রগুপ্তের বিজয়-পতাকা, তবু তখনো পর্যন্ত যারা আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাগমনের ভয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে নি, তারাও একসঙ্গে করলে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষাবলম্বন।

তখন চন্দ্রগুপ্তের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে পঞ্চনদের শিয়র থেকে ছিন্নমূল হয়ে লুটিয়ে পড়ল গ্রীকদের বিজয়-পতাকা।

অবশ্য এজন্যে চন্দ্রগুপ্তকে বহু যুদ্ধ জয় করতে হয়েছিল। তাদের কাহিনী কেউ লিখে রাখেনি বটে, কিন্তু শেষ-পরিণাম সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকেরই এক মত। চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বে পঞ্চনদের তীর

থেকে গ্রীক প্রভুত্ব হ'ল বিলুপ্ত। বহু গ্রীক তখনো ভারত ত্যাগ করলে না বটে, কিন্তু এখানে তারা আর প্রভুর মতো, বিজেতার মতো বাস করত না।

কিন্তু হতভাগ্য বীর পুরু বা পর্বতক স্বাধীনতার সুখ বেশীদিন ভোগ করতে পারেন নি। চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন ব'লে ভারতে প্রবাসী সমস্ত গ্রীকই ছিল তাঁর উপরে খড়্গহস্ত। সম্ভবত খৃঃ-পূঃ ৩১৭ অব্দে য়ুদেমস্ নামে এক গ্রীক দুরাত্মা মহারাজা পুরুকে গোপনে হত্যা ক'রে তাঁর একশো-বিশটি হাতী চুরি ক'রে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পঞ্চনদের তীর থেকে বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত আবার সসৈন্যে যাত্রা করলেন তখনকার ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ মগধ-সাম্রাজ্যে। বলা বাহুল্য এরও মূলে ছিল চাণক্যের মন্ত্রণা।

নন্দ-রাজ্যের উপরে চাণক্যের জাতক্রোধের একটা কারণের কথা শোনা যায়। চাণক্য ছিলেন মগধরাজ ধন-নন্দের দানশালার অধ্যক্ষ এবং ধন-নন্দ ছিলেন অতিদানশীল রাজা। চাণক্যকে তিনি তাঁর নামে এক কোটি টাকা পর্যন্ত দান করবার অধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু চাণক্যের উদ্ধত স্বভাব ও স্বাধীন ব্যবহার সইতে না পেরে শেষটা তিনি তাঁকে পদচ্যুত ক'রে তাড়িয়ে দেন এবং চাণক্যও প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।

দ্বিতীয়বার মগধ-সাম্রাজ্য আক্রমণ ক'রে চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়ী হ'লেন। নিহত ধন-নন্দের সিংহাসন এল তাঁর হাতে। মহা সমারোহে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল।

কিছুদিন পরে পঞ্চনদের তীরে হ'ল আবার নূতন বিপদের সূচনা।

আলেকজাণ্ডারের অন্যতম প্রধান সেনাপতি সেলিউকস্ (উপাধি 'নিকাটর' অর্থাৎ দিগ্বিজয়ী) তখন গ্রীকদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের

অধিকারী। সেই দাবি নিয়ে তিনিও আবার খৃঃ-পূঃ ৩০৫ অব্দে ভারত আক্রমণ করতে এলেন।

কিন্তু আলেকজাণ্ডারের অনুকরণ করতে গিয়ে সেলিউকস্ একটা মস্ত ভুল ক'রে বসলেন। আলেকজাণ্ডার যখন আসেন, উত্তর-ভারত ছিল তখন পরস্পরবিরোধী ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত, কোনো যথার্থ বড় রাজার সঙ্গে তাঁকে শক্তি-পরীক্ষা করতে হয় নি। এবং আগেই বলেছি, তিনিও শক্তিশালী মগধ-রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন।

কিন্তু সেলিউকসের আবির্ভাবের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত কেবল মগধের অধিপতি নন, তিনি সমগ্র উত্তর-ভারত বিজয়ী এবং তাঁর অধীনে প্রস্তুত হয়ে আছে ত্রিশ-হাজার অশ্বারোহী, নয়-হাজার গজারোহী ও ছয়লক্ষ পদাতিক সৈন্য! এর সামনে পড়লে স্বয়ং আলেকজাণ্ডারই যে দুরবস্থায় পড়তেন, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়!

ভারতে আবার যবন এসেছে শুনেই জাগ্রত সিংহের মতো চন্দ্রগুপ্ত ছুটে গেলেন পঞ্চনদের তীরে। ভারত-সৈন্য বন্যার মতো ভেঙে পড়ল পররাজ্যলোভী গ্রীকদের উপরে এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের খড়কুটোর মতন! সিন্ধুনদের কাছে এই মহাযুদ্ধ হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকরা আলেকজাণ্ডারের ছোট ছোট যুদ্ধেরও বড় বড় বর্ণনা রেখে গেছেন! কিন্তু এত-বড় যুদ্ধের কোনো বর্ণনাই গ্রীক ইতিহাসে পাওয়া যায় না! কারণ এ যুদ্ধ যে তাঁদের নিজেদের পরাজয়-কাহিনী! তাঁরা কেবলমাত্র স্বীকার করেছেন, চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হয়ে গ্রীক সেনাপতি সন্ধি স্থাপন করেন।

সেলিউকসের চোখ ফুটল। তাড়াতাড়ি হার মেনে তিনি নিজের সাম্রাজ্য থেকে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানকে চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হ'লেন ক্ষতিপূরণস্বরূপ। ভারত-সম্রাটের মন ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়েরও বিবাহ

দিলেন। এবং চন্দ্রগুপ্ত খুসি হয়ে শ্বশুরকে উপহার দিলেন পাঁচ শত হাতী।

গ্রীকরা ভারত থেকে বিদায় হ'ল। পঞ্চনদের তীর নিষ্কণ্টক।

চন্দ্রগুপ্ত যখন গ্রীকদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশী নয়। তারপর মাত্র আঠারো বৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্চনদের তীর থেকে যবন প্রভুত্বের সমস্ত চিহ্ন মুছে দেন, প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী অখণ্ড এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং দিগ্বিজয়ী সেলিউকসকে বাধ্য করেন মাথা নামিয়ে হার মানতে। সেই সুদূর অতীতেই তিনি প্রমাণিত করেন, য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বিশ্বজয়ী গ্রীকরাও ভারতীয় হিন্দু বীরদের সমকক্ষ নয়।

চন্দ্রগুপ্তের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, বিধর্মীদের কবল থেকে আর্যাবর্তকে উদ্ধার ক'রে তার পূর্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনা।

এ ব্রত যখন উদ্‌যাপিত হ'ল, তখন সিংহাসন আর তাঁর ভালো লাগল না। সেলিউকসের দূত মেগাস্থেনেস্ স্বচক্ষে দেখে চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ সুশাসিত সাম্রাজ্যের যে উজ্জ্বল ও সুদীর্ঘ বর্ণনা ক'রে গেছেন, আজও তা পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রভুত্বের ও ঐশ্বর্যের বাঁধনও আর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলে না। সেলিউকসের দর্পচূর্ণ করবার পর ছয় বৎসর মাত্র তিনি রাজত্ব করেছিলেন। তারপর পুত্র বিন্দুসারের হাতে রাজ্যভার দিয়ে তিনি যখন জৈন সন্ন্যাসী রূপে মুকুট খুলে চ'লে যান, তখনও তাঁর বয়স পঞ্চাশ পার হয় নি! ভারতের মতো রাজ-তপস্বীর দেশেই এমন স্বার্থত্যাগ সম্ভবপর! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ও রাজর্ষি অশোকও তাঁর যোগ্য পৌত্র!

জৈন পুরাণের মত ইতিহাস মেনে নিয়েছে। গ্রীক-বিজেতা ও ভারতের স্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের স্রষ্টা চন্দ্রগুপ্ত সন্ন্যাস গ্রহণ

ক'রে মহীশূরে বাস ক'রতেন। উপবাস-ব্রত নিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন!

জন্ম ও রাজ্যলাভ বাংলার পাশে পাটলিপুত্রে, প্রধান কর্তব্যের ক্ষেত্র পঞ্চনদের তীরে উত্তর-ভারতে এবং স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ সুদূর দাক্ষিণাত্যে,—চন্দ্রগুপ্তের আশ্চর্য জীবনের সঙ্গে জড়িত সমগ্র ভারতবর্ষ! প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁকে নিজের আত্মীয় ব'লে গ্রহণ ক'রে চরিত্রগঠন করুক, অদূর ভবিষ্যতে আবার তাহ'লে ফিরে আসবে আমাদের সোনার অতীত—অতীতের মতন গৌরবোজ্জ্বল নূতন ভারতবর্ষ!

ইতি